भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या
Class No. 182.Cd

पुस्तक संख्या
Book No. 901.1

रा० पु०/N. L. 38.
MGIP Sant.- 45 NL (Spl/69) -4-8-69 -1,00,000

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय
NATIONAL LIBRARY
कलकत्ता
CALCUTTA

अंतिम अंकित दिनांक वाले दिन यह पुस्तक पुस्तकालय से ली गई थी। दो सप्ताह से अधिक समय तक पुस्तक रखने पर प्रतिदिन ६ पैसे की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायगा।

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 6 P. will be charged for each day the book is kept beyond two weeks.

रा० पु० ४४
N. L. 44.
MGIP Sant.—42 NL (Spl/69)—3-7-69—50,000.

কালিদাস।

(আবির্ভাবকাল, জীবনী ও গ্রন্থালোচনা)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ,

প্রণীত।

কলিকাতা

২১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গিরিশ লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩০৮ সাল।

IMPERIAL LIBRARY
16. MAY. 18

কলিকাতা
৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নিউ ব্রিটানিয়া প্রেস হইতে
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 4472
DATE 13/11/09
CALCUTTA

RARE BOOK

১৮২.ঞ.৭০।৭

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার পাদমূলে বসিয়া কাব্য ও দর্শনাদিশাস্ত্রের উপদেশ
লাভ করিয়াছি, যাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ, অসীম অনুগ্রহ
এ জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে, সেই মহানুভব
অশেষশাস্ত্রজ্ঞ পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ

মহাশয়ের করকমলে ভক্তিসহকারে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

কালিদাসের আবির্ভাবকাল আমি খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে নিরূপণ করিলাম। পূর্ব্বে আমি কালিদাসকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু উড়িষ্যার ইতিহাস আলোচনায় সে ধারণা আমার গিয়াছে। যে সকল কারণে আমি খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে কালিদাসের আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। নীরস বিষয়ের বহুবিস্তৃত আলোচনা সকলের নিকট তৃপ্তিপ্রদ নহে এজন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। এক্ষণে নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিচার করিবেন বিরোধী মতের সম্যক্ উল্লেখ হইয়াছে কি না। কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে নিতান্ত অবিশ্বাস্য প্রবাদগুলি উদ্ধৃত করি নাই।

অবশেষে কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে "যূথিকা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র ও কল্যাণভাজন শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার সময় প্রুফাদি সংশোধন করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তা না পাইলে কখনই পুস্তক মুদ্রিত হইত না। ইতি।

শ্রীচারুচন্দ্র শর্ম্মা।

গৈপুর,
১০ই চৈত্র, ১৩০৮ সাল।

03/1 738
1276

কালিদাসের জীবনী।

কালিদাসের আবির্ভাবকাল।

বরং উত্তরমেরু আবিষ্কার করিতে যাত্রা করিলে কৃতকার্য্য হইবার আশা করা যায়; চন্দ্রলোকে আমাদের ন্যায় প্রাণী আছে কি না তাহারও মীমাংসা করা বরং সম্ভব; মঙ্গলগ্রহস্থ জীবগণের সহিত আমাদের সংবাদ আদান প্রদান সম্ভব কি না তাহারও বরং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, তথাপি কালিদাসের আবির্ভাব কাল সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিয়া পুরাতত্ত্বজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের তৃপ্তিসাধন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। বিষয়টী চিরকালই সাহিত্যজগতের প্রহেলিকা হইয়া আছে। এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন না। বস্তুতঃ যে বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক লেসেন, বেবর, জেকোবি, কের্ণ, মোক্ষমূলর, বুলর প্রভৃতি অগাধধীশক্তিশালী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন নাই, সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের পক্ষে চপলতা প্রকাশ মাত্র। অপিচ উপহাসাস্পদ হইবার কথা। ইহা জানিয়াও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য এই যে, কয়েকটী অনালোচিত ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রতি পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মনোযোগ

আকর্ষণের চেষ্টা করিব। কালিদাসের গ্রন্থ হইতে যে কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, সে গুলির যথাযথ আলোচনা এপর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। সুতরাং যাহাতে সেগুলির আলোচনা হয় তাহাই আমার উদ্দেশ্য।

কালিদাসের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে তিনটী মত প্রচলিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে কালিদাস উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী। উক্ত নরপতি সংবৎ নামক অব্দ স্থাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ অব্দের ১৯৫৮ বৎসর চলিতেছে। অতএব কালিদাস ঐ মতানুসারে খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দের লোক হইতেছেন। পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও নগেন্দ্রনাথ বসু উক্ত মতাবলম্বী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে বলেন, কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য মতাবলম্বী ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ডাক্তার ভাওদাজী, রামদাস সেন, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া বিশ্বাস করেন।

কিরূপ ভিত্তির উপর উল্লিখিত মত কয়টী স্থাপিত অগ্রে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য প্রথমে প্রাচীন মতের প্রতিপোষক প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। ঐ সকল প্রমাণের বলাবল নির্ণয়ের ভার নিরপেক্ষ পাঠকগণের উপর রহিল।

কুমারিকা খণ্ডের যুগব্যবস্থাধ্যায়ে বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী দেখা যায়—

ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্য রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে।

অর্থাৎ কলির তিন সহস্রেরও অধিক কতিপয় বর্ষগত হইলে বিক্রমাদিত্য রাজ্যলাভ করিবেন। পাঠান্তরে কলির ৩০২০ বৎসর গত হওয়ায় উল্লেখ দেখা যায়। ৩১০২ কল্যব্দে খৃষ্টাব্দের আরম্ভ। তাহা হইলে ৩১০২—৩০২০=৮২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিক্রমাদিত্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ধরিতে হয়। কুমারিকা খণ্ডে নন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যে সকল শ্লোক আছে তাহার সহিত প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের কোন অনৈক্য দেখা যায় না। সুতরাং প্রাচীন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে উক্ত শ্লোকটী বিশেষ প্রামাণিক মনে করেন।

অতঃপর বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার "নবরত্ন" সভা ও সেই সভার কালিদাসের বিদ্যমান থাকা সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়া থাকে। কালতন্ত্র ও জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক জ্যোতিষিক গ্রন্থ কালিদাসের নামে প্রচলিত। তাহা হইতেই নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হয়—

শঙ্কুঃ সুবাক্ বররুচির্ম্মণিরংশুদত্তো
জিষ্ণুস্ত্রিলোচনোহরি র্ঘটকর্পরাখ্যঃ।
অন্যেঽপি সন্তি কবয়োঽমরসিংহ পূর্ব্বা
যস্যৈব বিক্রমনৃপস্য সভাসদোঽমীঃ॥

যে বিক্রম নৃপতির শঙ্কু, সুবাক্‌বররুচি, মণি, অংশুদত্ত, ত্রিলোচন, ঘটকর্পর উপাধিধারী হরি; অমরসিংহ প্রভৃতি কবি সভাসদ ছিলেন।

সভ্যো বরাহমিহিরঃ শ্রুতসেননামা
শ্রীবাদরায়ণো মনিথঃ কুমার সিংহঃ।
শ্রীবিক্রমার্কো নৃপসংসদি চৈতে
শ্রীকালতন্ত্রঃ কবয় স্বপরে মদাস্থাঃ॥

ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক।

ধন্বন্তরি ক্ষপনকামরসিংহ শঙ্কু
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্ত॥

ধন্বন্তরি, বৌদ্ধ অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি এই নয়জন নবরত্ন নামে খ্যাত ছিলেন। বরাহমিহির একজনের নাম নহে। পিতাপুত্রে তাঁহারা উক্ত নামে খ্যাত। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের "খ্যাতো" স্থানে কেহ কেহ "সভ্য" পাঠ ধরিয়া থাকেন এবং একটী রত্ন মনে করিয়া বরাহমিহিরকে অভিন্ন ব্যক্তি অবধারণ করিয়া থাকেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বরাহ ও মিহির দুই ব্যক্তি। বরাহ পিতা, মিহির পুত্র।

অতঃপর জ্যোতির্ব্বিদাভরণের রচনাকাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় দেখা যায়—

কাব্যত্রয়ং সুমতিকৃৎ রঘুবংশপূর্ব্বং
পূর্ব্বং ততোহন্থ কিঞ্চিৎ শ্রুতিকর্ম্মবাদঃ।
জ্যোতির্ব্বিদাভরণ কালবিধানশাস্ত্রং
শ্রীকালিদাসকবিতোহি ততো বভূব॥

বর্ষৈঃ সিন্ধুরদর্শনাম্বর গুণৈঃ যাতে কলৌসম্মিতে।
মাসে মাধব সংজ্ঞকে চ বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ॥
বর্ষে শ্রুতি স্মৃতি বিচার বিবেক রম্যে
শ্রীভারতে খধৃতি সম্মিত দেশপীঠে।
মত্তোঽধুনা কৃতিরিয়ং সতি মালবেন্দ্রে
শ্রীবিক্রমার্ক নৃপরাজবরে সমাসীৎ॥

প্রথমে রঘুবংশ প্রভৃতি তিন খানি কাব্য, তৎপরে যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্মবাদ গ্রন্থ তৎপরে এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক কাল বিধান-শাস্ত্র হইয়াছে। কলিকালের ৩০৬৯ বৎসর গত হইল; বৈশাখ মাসে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। শ্রুতি স্মৃতি বিচার পরিপূর্ণ রমণীয় ১৮০ প্রধান জনপদ যুক্ত ভারতবর্ষ মধ্যে মালবপতি শ্রীবিক্রমাদিত্য নামক রাজশ্রেষ্ঠের জীবদ্দশায় আমাহইতে (কালিদাস) এই গ্রন্থ আবির্ভূত হইল। অর্থাৎ ৩৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

বাসবদত্তা সংস্কৃত ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ। সুবন্ধু নামক কবি উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি নিজ গ্রন্থে আপ-নাকে বররুচির ভাগিনেয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং গুণগ্রাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহার সময়ে জীবিত ছিলেন না বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপিতে এই মত সমর্থিত হইয়াছে দেখা যায়। তাহাতে উল্লিখিত আছে যে বিক্রমাদিত্য অতি প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তাঁহার "নবরত্ন" নামক পণ্ডিত সভা ছিল। অমর সিংহদেব সেই নবরত্নের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। এবং বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া প্রাচীন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ দৃঢ়তা সহকারে কালিদাসকে বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী ও তাঁহার নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন, নবরত্ন-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থেও নবরত্নের উল্লেখ আছে।

কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী ভারতীয় অনেক পণ্ডিত এমতে আস্থাবান্ নহেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, (১) কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী ও নবরত্ন সভার অন্তর্বর্ত্তী হইলে তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইতেছেন। কেননা নবরত্নের অন্যতম রত্ন বৃহৎসংহিতা রচয়িতা বরাহাচার্য্য যে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ৫০৭ শকে স্বর্গগমন করিয়াছিলেন একথা ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডখাদ্য নামক গ্রন্থের টীকায় ডাক্তার ভাওদাজী আবিষ্কার করিয়াছেন।

(২) অধ্যাপক মোক্ষমূলর, জেকোবী, কের্ণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থে "যামিত্র", "কেন্দ্র" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, কালিদাস খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। কেননা ঐ শব্দগুলি গ্রীক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। গ্রীক জ্যোতিঃশাস্ত্র খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কালিদাস যখন ঐ সকল শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন তখন তিনি খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(৩) কবি বাণভট্ট স্বপ্রণীত হর্ষচরিত নামক গ্রন্থে কালিদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া নব্যমতাবলম্বী পণ্ডিতগন স্থির করিয়াছেন, কালিদাস কাশ্মীররাজ প্রবরসেনের সমসাময়িক। তাঁহারা আরও বলেন যে কালিদাস উজ্জয়িনীপতি ভোজবিক্রমের

সভাসদ ছিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ কাশ্মীর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম মাতৃগুপ্ত। শেষ বয়সে তিনি প্রবর সেনকে কাশ্মীরের আধিপত্য প্রদান করিয়া কাশীতে যাইয়া বাস করেন এবং স্ত্রীবিরহে মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন। বিতস্তা নদীর উপর প্রবরসেন যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া কালিদাস (বা মাতৃগুপ্ত) প্রাকৃত ভাষায় সেতুকাব্য নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

(৪) কেহ কেহ মালবরাজ যশোধর্ম্মদেবকে শকারী বিক্রমাদিত্য মনে করেন। উক্ত নরপতি ষষ্ঠ শতাব্দীতে শকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং কালিদাসকেও তাঁহারা উক্ত নরপতির সভাসদ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন।

(৫) কালিদাস প্রণীত মেঘদূত নামক খণ্ডকাব্যে "দিঙ্নাগ" নামের উল্লেখ আছে। টীকাকার মল্লিনাথের মতে উক্ত প্রকার উল্লেখ দ্বারা কালিদাস তাঁহার প্রতিপক্ষ ও দোষদর্শী দিগনাগাচার্য্য নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত বৌদ্ধ ছিলেন। তিব্বতদেশীয় গ্রন্থকারগণ তাঁহাকে বসুবন্ধুর শিষ্য ও খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। সুতরাং কালিদাসও খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক হইতেছেন।

নব্য মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি উল্লিখিত হইল। এক্ষণে প্রাচীন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ঐ সকল যুক্তির কিরূপ খণ্ডন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) প্রাচীন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন বৃহৎসংহিতা প্রণেতা বরাহাচার্য্য ও নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন বরাহ বা বরাহ-

মিহির একই ব্যক্তি নহেন। কেননা তাহা হইলে বৃহৎ সংহিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। অপিচ সূর্য্যের গতি নির্ণয় সম্বন্ধে বৃহৎ সংহিতায় যে অব্দ পিণ্ড ধরা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমানকালের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, বরাহাচার্য্যের বৃহৎসংহিতা রচনাকাল ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ধরিতে হয়। উক্ত সময় হইতে বর্ত্তমান সময়ে ২১ অয়নাংশেরও অধিক অন্তর হইয়াছে। ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক এক অয়নাংশ ধরা হয়। সুতরাং চৌদ্দশত বৎসরের কিছু অধিক অন্তর দেখা যায়। যদি ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে বৃহৎসংহিতা রচিত হইয়া থাকে তবে ৫০৭ শকে (৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) বরাহাচার্য্যের পরলোকগমন কি করিয়া সঙ্গত হইতে পারে?

প্রবাদ অনুসারে মিহিরের পিতা (খনার শ্বশুর) বরাহ ৮০ (বা ৮৫) বৎসরের অধিক জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে বৃহৎসংহিতা রচয়িতা বলিলে তাঁহার আয়ু প্রায় ১২০ বৎসর হয়। কিন্তু যখন স্পষ্ট উল্লেখ নাই যে তিনিই বৃহৎসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অন্যায়। বিশেষতঃ উজ্জয়িনীর জ্যোতির্বিদগণ যখন অদ্যাপি তিন জন বরাহের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের কালনির্ণয় করিয়া থাকেন, তখন কষ্টকল্পনার আবশ্যকতা দেখা যায় না। প্রথম বরাহ খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে, ২য় ব্যক্তি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমে, তৃতীয় জন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাঁহাদের মতে শেষোক্ত বরাহ বৃহৎসংহিতা রচয়িতা।

(২) অতঃপর কালিদাস গ্রীক জ্যোতিষ হইতে "যামিত্র" প্রভৃতি শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন কিনা? ইহার উত্তরে প্রাচীনমত-

বাদীগণ বলেন যে ভারতীয় আর্য্যগণই সর্ব্বপ্রথমে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "যামিত্র" শব্দ যে গ্রীক "ডিয়ামেট্রন" শব্দের অপভ্রংশ এবং কেন্দ্র প্রভৃতি শব্দও যে গ্রীক শব্দের অপভ্রংশ ইহা মনে করিবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। ঐ শব্দগুলি যে এক মূল শব্দ হইতে গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় উৎপন্ন হয় নাই ইহার প্রমাণ কোথায়? বিশেষতঃ কেন্দ্র প্রভৃতি শব্দগুলি কালিদাসের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং কেবলমাত্র শব্দসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া, উপযুক্ত যুক্তি না দেখাইয়া কালিদাসকে গ্রীক জ্যোতিষের নিকট ঋণী ও তাহা হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা একদেশদর্শিতা মাত্র।

(৩) তৎপরে বাণভট্টের লিখনভঙ্গীতে কালিদাস প্রবরসেনের সমসাময়িক ও ভোজবিক্রমের সভাসদ্ কি না? তিনি ও মাতৃগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি কি না?

এতদুত্তরে পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি হইলে নিশ্চয়ই তিনি প্রবরসেনের সমসাময়িক ও ভোজবিক্রমের সভাসদ হইতেছেন। সুতরাং অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য কালিদাসের অপর নাম মাতৃগুপ্ত কিনা? যখন শকুন্তলার প্রস্তাবনায় কবি আপনাকে কালিদাস নামে পরিচিত করিয়াছেন, তখন তাহাই যে তাঁহার প্রচলিত নাম তৎপক্ষে সন্দেহ থাকিতেছে না। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণও তাঁহাকে কালিদাস নামেই পরিচিত করিয়াছেন। বাণভট্ট, প্রসন্ন রাঘবপ্রণেতা জয়দেব, টীকাকার মল্লিনাথ, দক্ষিণাবর্ত্তনাথ, প্রভৃতি কালিদাস নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। শিলালিপিতেও ঐ নামেই কবি উল্লিখিত হইয়াছেন।

পুরুষোত্তম কৃত ত্রিকাণ্ডশেষে কালিদাসের কয়েকটী নাম দেখা যায় যথা—রঘুকার, মেধারুদ্র ও কোটীজিৎ। মাতৃগুপ্ত নামের গন্ধমাত্র নাই। শকুন্তলার টীকাকার রাঘবভট্ট মাতৃগুপ্তের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্বারা জানিতে পারা যায় মাতৃগুপ্ত একজন প্রধান কবি ছিলেন। কিন্তু তিনিই যে কালিদাস ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বরং তিনি যে কালিদাস নহেন তাহাই সপ্রমাণিত হইতেছে।

এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার আরও কারণ আছে। সুন্দরমিশ্রের নাট্যপ্রদীপে দেখা যায় মাতৃগুপ্ত নাট্যাচার্য্য মহামুনি ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রের বিবৃতি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত সূক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত বিরচিত অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কালিদাসের শ্লোকগুলি তদীয় নামে প্রচলিত গ্রন্থে দেখা যায়। মাতৃগুপ্তের শ্লোকগুলি কালিদাসের নামে পরিচিত কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কালিদাসকে মাতৃগুপ্ত বলিতে যাওয়া কিরূপ অসঙ্গত ও যুক্তিহীন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতঃপর মাতৃগুপ্ত ও প্রবরসেন সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীতে যাহা উল্লিখিত আছে তাহা প্রদর্শিত হইল।

রাজতরঙ্গিণীর মতে মাতৃগুপ্ত জনৈক কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণ। উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পাথেয় ও একখানি পত্র দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেন একাকী যাইয়া তাঁহার দেশের শাসনকর্ত্তার নিকট পত্রখানি অর্পণ করেন। মাতৃগুপ্ত অনেক লাভের আশা করিয়া

আসিয়াছিলেন কিন্ত রাজা তাঁহাকে এরূপ ভাবে বিদায় করায় নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে দেশে ফিরিলেন এবং রাজাজ্ঞা পালন করিলেন। শাসনকর্তা লিপি পাঠ করিয়া দেখিলেন তাহাতে লেখা আছে "আমি (বিক্রমাদিত্য) অনেক বিষয়ের জন্য পত্র বাহকের নিকট ঋণী। তিনিও অনেক আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ সহ্য করিয়াছেন, পত্রপাঠমাত্র তাঁহাকে কাশ্মীরের সিংহাসন দান করিবে।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় মাতৃগুপ্ত রাজানুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়া কাশ্মীরের শাসনকর্তৃত্ব পাইয়াছিলেন, অথবা কাশ্মীরের তাৎকালিক অশান্তির অবস্থায় তদ্দেশীয় জনৈক বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নিয়োগ করা বিক্রমাদিত্য আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। মাতৃগুপ্ত প্রবরসেনকে তাঁহার পৈতৃক রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন। ইহা হইতে মাতৃগুপ্ত যে বিক্রমাদিত্যের সভাসদ তাহা ত প্রতিপন্ন হইল না।

অতঃপর কালিদাস ও প্রবরসেন সমসাময়িক কিনা? বাণভট্টের নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় শ্লোক হইতে উক্ত মত সমর্থিত হইয়া থাকে।

কীর্ত্তি প্রবরসেনস্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥

নব্যমতে উক্ত শ্লোকগুলিদ্বারা কালিদাস যে (প্রবরসেন নির্ম্মিত বিতস্তাসেতু দর্শনে) সেতুকাব্য নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাই বলা হইয়াছে। প্রাচীন মতবাদীরা বলেন উদ্ধৃত শ্লোকে কালিদাসকে সেতুকাব্য প্রণেতা বলা হয় নাই। প্রবরসেনকেই উক্ত কাব্যপ্রণেতা বলা হইয়াছে। উক্ত কাব্যের প্রাচীন টীকাকার কুলনাথ স্পষ্টই একথার উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও আধুনিক

টীকাকার রামদাস কালিদাসকে উক্ত কাব্যপ্রণেতা বলিয়াছেন ও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞায় প্রবরসেনের জন্য তিনি উক্ত কাব্য রচনা করয়াছিলেন এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি যখন প্রবরসেনের রাজ্যপ্রাপ্তির বহুপূর্ব্বে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন রাজতরঙ্গিনীতে এরূপ উল্লেখ আছে, তখন টীকাকার রামদাসের কথায় আদৌ আস্থা স্থাপন করা যায় না। প্রাচীন টীকাকার কুলনাথের কথায় প্রবরসেনকেই সেতুকাব্য প্রণেতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। প্রবরসেন যে সৎ কবি ছিলেন তাহার উল্লেখও দেখা যায়।

(৪) তৎপরে যশোধর্ম্মদেব ও বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি কিনা? পূর্ব্বে যখন মহামতি ফ্লীট্ সাহেব শিলালিপির পাঠ সংস্থান করেন, তখন তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই যে নামটী যশোবর্ম্মন্ কি যশোধর্ম্মন্। যশোবর্ম্মন্ হইলে সকল গোল চুকিয়া যাইত। যাহা হউক যশোধর্ম্মদেব মালব রাজ্য করায়ত্ত করিয়া কাশ্মীর রাজ মিহিরকুলকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই যে শকারী বিক্রমাদিত্য তাহাতে নব্যমতাবলম্বী ফার্গুসন প্রভৃতি সাহেবদিগের সন্দেহ নাই। তিনি ৫৬ খৃঃ পূঃ মালব সম্বৎ নিজ নামে "বিক্রম সম্বৎ" আখ্যায় চালাইয়াছিলেন। তবে অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া সেকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একথা বলার কারণ এই যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের কোন শিলালিপিতে বিক্রম সম্বতের উল্লেখ তাঁহারা দেখেন নাই।

এতদুত্তরে প্রাচীন মতের পক্ষপাতী মহাশয়েরা বলেন যে যশোধর্ম্মদেব যদি কাশ্মীররাজ মিহিরকুলকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া

থাকেন তবে তিনি ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের লোক হইতে পারেন না। কেননা মিহিরকুল যদি তোরামানের পুত্র হন তবে তাঁহার উক্ত সময়ে বিদ্যমান থাকা সম্ভব নহে। গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের শিলালিপিতে তোরামানের নামোল্লেখ আছে। মালব, গুজরাট, কাশ্মীর প্রভৃতি তাঁহার অধীন ছিল।

ডাক্তার ভাওদাজী বিভিন্ন শিলালিপিতে উল্লিখিত তোরামানকে অভিন্ন ব্যক্তি অবধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্য-কাল সপ্তম শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক উইলসন ও মেজর ট্রয়ার তোরামানকে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মতে তিনি খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক এবং মহামতি কানিংহাম তোরামানকে ৩৫৬ খৃষ্টাব্দের লোক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অধ্যাপক মোক্ষমুলরের মতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন, ইহার মধ্যে সুপণ্ডিত কানিংহাম সাহেবের যুক্তি অকাট্য বলিয়া বোধ হয়। যখন তোরামানের রাজ্যকাল লইয়া এত মতবিরোধ তখন নিঃসন্দেহরূপে তৎপুত্রের রাজ্যকাল স্থির করিবার সম্ভাবনা কোথায়? আর এক কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। রাজতরঙ্গিনীর মতে প্রবর সেন মিহিরকুলের সাতশত বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং মিহিরকুলকে খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ধরিলে প্রবরসেনকে খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিতে হয়। কিন্তু বাণভট্টের গ্রন্থে যখন প্রবরসেন উল্লিখিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে সপ্তম শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। সুতরাং মিহিরকুলের রাজ্যকাল খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে যাইয়া পড়ে। কাজেই ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের লোক হইয়া যশোধর্ম্ম দেব তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন না। তাহা

হইলে তাঁহাকে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর শকারী বিক্রমাদিত্য হইতে হয়।

অপরঞ্চ পূর্ব্বে যখন খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শিলা-লিপিতে বিক্রম সম্বতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই, তখন ফার্গুসন প্রভৃতি কল্পনাপ্রিয় পুরাবিদ্‌গণের অনুমান কতকটা ধর্ত্তব্য হইতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে যখন ফ্লীট্ সাহেব ১ম, ২য়, এবং ৩য় শতাব্দীর অনেকো-নেক শিলালিপিতে বিক্রম সম্বতের উল্লেখ দেখিয়াছেন, তখন আর ব্রাহ্মণদিগকে অকারণ দোষী করিলে কি হইবে। সুতরাং ডাক্তার বুলর প্রভৃতি পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ মত পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

(৫) অতঃপর দিঙ্‌নাগের কথা। টীকাকার মল্লিনাথের নির্দ্দেশ অনুসারে যদি মেঘদূতে উল্লিখিত দিঙ্‌নাগ দার্শনিক দিগ্‌নাগাচার্য্যের নাম হয় এবং তিনি যদি খ্রীষ্টির ২৫২ অব্দের লোক স্থিরীকৃত হন, তাহা হইলে যাঁহারা কালিদাসকে খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিতেন তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইতেছে। যাঁহারা কালিদাসকে খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষসমর্থিত হইতেছে। এক্ষণে আর আমাদের যশো-ধর্ম্মদেব ও প্রবরসেন ঘটিত বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক হইবেনা। সে সমস্ত মত নিরাকৃত হইতেছে। কিন্তু কথা হই-তেছে মল্লিনাথ কালিদাসের বহু পরবর্ত্তী। তিনি ভিন্ন আর কেহ এ প্রবাদের উল্লেখ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ এই মল্লিনাথোক্ত দিঙ্‌নাগ তিব্বতদেশীয় গ্রন্থোক্ত বৌদ্ধ দার্শনিক দিগনাগাচার্য্য কিনা? তৃতীয়তঃ তিব্বতীয় যে সকল কাল নির্ণয় দেখা যায় তাহা প্রায়ই ভ্রমসংকুল। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভ সম্বন্ধে তিব্বতে ভূরি ভূরি মত

প্রচলিত আছে। কেহ বলেন ২৪০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে শাক্যসিংহ পরলোক গমন করেন। কাহারও মতে তিনি খ্রীষ্টজন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাই বলিয়া একথা বলা যাইতে পারে না যে উক্ত দিগনাগাচার্য্য সম্বন্ধীয় উল্লেখ ভ্রমপূর্ণ। কিন্তু যতদিন পূর্ব্বোক্ত তিনটী প্রশ্নের যথাযথ আলোচনা না হইতেছে ততদিন এ মত কতদূর শ্রদ্ধেয় হইবে তাহা বলিতে পারি না। অতঃপর আমরা কালিদাসের স্বপ্রণীত গ্রন্থ হইতে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিবার সহায়তা হইতে পারে কিনা দেখাইব। পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

কালিদাস প্রণীত রঘুবংশের চতুর্থসর্গে রঘুর দিগ্বিজয় ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয় অথবা কবির সমসাময়িক ঘটনা লক্ষ্য করিয়া যে কবি এ সর্গ লিখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা রামচন্দ্রের প্রপিতামহ রঘু কখনও নৌসাধনোদ্যত বাঙ্গালী বা অশ্বসাধন পারসীকদিগকে জয় করেন নাই। বস্তুতঃ বাল্মিকী রামায়ণে এবিষয়ের কিছুমাত্র উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং ইহা যে কবির সমসাময়িক ঘটনাবলম্বনে লিখিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এই দিগ্বিজয় বর্ণনার একস্থানে আমরা দেখিতে পাই, কপিশানদী পার হইয়া রঘুসৈন্য কলিঙ্গাভিমুখে চলিয়াছে। উৎকলবাসীগণ পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। মহেন্দ্রগিরিতে কলিঙ্গরাজের রাজধানী ছিল। তাঁহার প্রাসাদবাতায়ন হইতে সমুদ্রের তরঙ্গমালা দৃষ্ট হইত। তাঁহার অনেক হস্তী-সৈন্য ছিল। তথাপি তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজা রঘু তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করেন নাই।

(১) ইহা হইতে আমরা নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি। উড়িষ্যা তখন স্বাধীন রাজ্য ছিল না, কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উড়িষ্যার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, ৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যযাতিকেশরী উড়িষ্যায় স্বাধীনতা সংস্থাপন করেন। যাজ-পুরে তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ভুবনেশ্বর মন্দির তিনিই নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাজপুর ও ভুবনেশ্বর উভয় স্থানেই তিনি বাস করিতেন। কিন্তু এই দুইটী স্থানের কোনটীই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নহে। কোন স্থানের রাজ-প্রাসাদ হইতে সমুদ্র দৃষ্ট হইত না। যখন যযাতিকেশরী উড়িষ্যা স্বাধীন করিয়াছিলেন তাহার দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে (৪৭৪-১৫০ = ৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে) কলিঙ্গরাজ্য ও রাজধানী রক্তবাহু নামক যবন জলপথে আক্রমণ করিয়াই ধ্বংশ করিয়াছিল। উক্ত যবনের বংশধরগণ দেড়শতবৎসর উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ শাসন করিলে যযাতিকেশরী তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া উক্ত দেশদ্বয় অধিকার করেন। এবং জলদস্যুর আক্রমণ হইতে আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্যই যাযপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে কালিদাস ষষ্ঠশতাব্দীর লোক হইলে, কলিঙ্গরাজ্যের রাজধানী, মহেন্দ্র-গিরিতে (অর্থাৎ সমুদ্রতীরে) কিরূপে দেখিতে পাইতে পারেন। তিনি যখন মহেন্দ্রগিরিতে কলিঙ্গ রাজধানী থাকার উল্লেখ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে ৩২৪ খৃষ্টাব্দের : পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে বোধ হয় আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(২) অনন্তর উক্ত দিগ্বিজয় বর্ণনায় একস্থানে আমরা পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লখ দেখিতে পাই। এই পাণ্ড্যরাজ্য যে খ্রীষ্টিয় তৃতীয়

শতাব্দীতে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল ইতিহাসে এরূপ উল্লেখ আছে। অঙ্গরাজ্যের বৌদ্ধগণ দক্ষিণ দেশে যাইয়া পাণ্ড্যরাজ্যস্থানে অন্ধ্রুরাজ্য স্থাপন করেন। সুতরাং কালিদাস যখন পাণ্ড্যরাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অঙ্গরাজ্য স্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক বলিতে হয়। তাহা হইলে তিনি আর খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কি করিয়া বিদ্যমান থাকিতে পারেন ?

(৩) রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে মগধরাজধানী 'পুষ্পপুরের উল্লেখ দেখা যায়। কুসুমপুর বা পুষ্পপুর শুঙ্গবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। তাঁহাদের অবনতির সহিত পুষ্পপুরেরও বিলয় ঘটিয়াছিল। পুরাবিদ্‌গণের মতে বিলাসের লীলাভূমি পুষ্পপুর খ্রীষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫০ অব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। রঘুবংশের মধ্যে উক্ত স্থানের উল্লেখ থাকায় কালিদাসকেও সেই সময়ের লোক বলিতে হয়।

(৪) কালিদাস নিজগ্রন্থে ভারতবর্ষের নানাস্থানের ও জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল রাজ্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বলভীরাজ্যের উল্লেখ দেখা যায় না। তিনি তৃতীয় বা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইলে সম্ভবতঃ প্রবল বলভীরাজ্য দেখিতে পাইতেন। কেননা উক্ত রাজ্য খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংস্থাপিত হয়। কবিভট্টি বলভীরাজশ্রীধরসেনের আশ্রয়ে থাকিয়া নিজকাব্য প্রণয়ন করেন। ভট্টি নিজ গ্রন্থে রঘুবংশ হইতে অনেক তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি ৩২০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা। কালিদাসের গ্রন্থে বলভীরাজ্যের উল্লেখ না থাকায় তাঁহাকে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারা যায় না কি ?

(৫) কালিদাস প্রণীত কুমার-সম্ভব প্রভৃতি কাব্য যবদ্বীপের কাবিভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বঙ্গ ও কলিঙ্গবাসী আর্য্যগণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করেন। খ্রীষ্ট জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীবীর বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টিয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই প্রবল কলিঙ্গরাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় হইতে বাঙ্গালীদিগেরও নৌযুদ্ধবিদ্যা হীনতা প্রাপ্ত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে উহা একেবারেই লোপ পাইয়াছিল, কাজেই ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষমতা আর তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং কালিদাস ষষ্ঠশতাব্দীর লোক হইলে যবদ্বীপে তাঁহার গ্রন্থগুলি কিরূপে নীত বা অনূদিত হইতে পারে?

(৬) অতঃপর হূনদিগের কথা। খৃষ্ট পূর্ব্বে প্রথম শতাব্দী হইতে উপর্যুপরি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বিতাড়িত হইলেও খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে হূনরাজ কনিষ্ক ভারতসীমান্তে রাজ্যস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। হূনেরা তথন এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, নিজেদের স্বতন্ত্র অব্দ স্থাপনেও কৃতকার্য্য হইয়াছিল। হূনদের পরাজয় বিঘোষক সম্বৎ অব্দ লোপ করিবার বাসনায় সম্ভবতঃ তাহারা শাক-সম্বৎ চালাইতে প্রয়াসী হইয়াছিল। অদ্যাপি তাহাদের শাক প্রচলিত আছে। কালিদাস যে ভাবে হূনদিগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা ভারতের একটী পৃথক জাতি বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। তাহারা যে ভারতসীমান্তের উপদ্রবকারী ছিল ইহাই বুঝায়। গিবনের ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, হূনেরা চীনদেশ হইতে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে তাড়িত হইতে থাকে। অতঃপর তাহারা বাহ্লিক রাজ্য ধ্বংস করিয়া ভারতসীমান্তে উপনীত হয়। সুতরাং তাহাদের প্রবল আক্রমণ

লক্ষ্য করিয়া যে কালিদাস তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অনুমান করা কি সঙ্গত নহে ?

বঙ্গদেশীয় কোন কোন পণ্ডিতের মতে কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন ; কেননা তিনি যেরূপ আদিরসঘটিত শ্লোক লিখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কবি সেরূপ লিখিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন। সম্ভবতঃ এইজন্য অনেক অশ্লীল কবিতা কালিদাসের নামে প্রচলিত হইয়াছে।

কালিদাসের জীবনী।

মিথিলায় প্রবাদ আছে কালিদাস মিথিলাবাসী ছিলেন। মধু-বানীর নিকট যে সহকারতরুমূলে কালিদাস সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন অদ্যাপিও সেস্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং অনেক অদ্ভুত গল্পও শুনিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ ভারতের নানা প্রদেশের লোক কালিদাসকে স্বদেশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু একমাত্র উজ্জয়িনী ভিন্ন অপর কোন স্থান কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে পুরাতত্ত্ববিদেরা প্রস্তুত নহেন। স্বপ্রণীত গ্রন্থে কালিদাস যদিও কিছুমাত্র আত্মপরিচয় দেন নাই, তথাপি মেঘদূতের পূর্ব্বভাগে তিনি যেন উজ্জয়িনীর প্রতি একটু পক্ষ-পাতিত্ব দেখাইয়াছেন— মেঘের পথ বক্র করিয়া দিয়া তাহাকে উজ্জয়িনীর শোভা সমৃদ্ধি দর্শন করিতে বলিয়াছেন—উজ্জয়িনীবাসীগণ যেন স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিবার সময় স্বর্গলোকের এক সারাংশ সঙ্গে আনিয়া-ছেন। ইহা হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, উজ্জয়িনী কবির

জন্মভূমি ও মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনের বসতিস্থান না হইলে কালিদাস কখনও এরূপ লিখিতেন না। বস্তুতঃ উজ্জনগরী যে কালিদাসের প্রিয় বাসস্থান ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

কালিদাসের আবির্ভাব কাল বা বাসস্থানের নির্দ্দেশ করিবার উপায় হইলেও তাঁহার জীবনী অবগত হইবার কোন উপায়ই নাই। এ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে কেহই আস্থাস্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রবাদ অনুসারে কালিদাস দেখিতে অতি কদাকার ছিলেন। জিহ্বার জড়তা হেতু ভাল করিয়া তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইত না। তিনি বাল্যকালে এরূপ গণ্ডমূর্খ ছিলেন যে, যে বৃক্ষশাখায় উঠিতেন তাহারই পূর্ব্বভাগ ছেদনে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে বাল্যকাল কাটিয়া যায়। এই সময়ে বিদ্যোত্তমা নাম্নী কোন বিদ্যাবতী রমণী বিদ্যাবিচারে পরাভূতকারীকে পতিত্বে বরণ করিবার পন করিলে অনেকানেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট পরাজিত হন। অতঃপর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য পরাজিত পণ্ডিতগণ বিদ্যোত্তমাকে মূর্খের সহিত বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা মূর্খের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, কালিদাস যে বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়াছেন তাহারই মূলভাগ ছেদন করিতেছেন। পণ্ডিতগণের ধারণা হইল ইহাপেক্ষা মূর্খ সম্ভবে না। তখন তাঁহারা কালিদাসকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া বৃক্ষ হইতে নামাইলেন ও সঙ্গে লইয়া চলিলেন। বিবাহের নামে বোবারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়—অন্যে পরে কা কথা। সুতরাং কালিদাস যে পণ্ডিতগণের অনুগামী হইলেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন সঙ্কেত দ্বারা বিচার হইবে—কথায় নহে।

RARE BOOK
Smb 4472 dt- 13/10/09

বিদ্যোত্তমা তাহাই স্বীকার করিলেন। অতঃপর পণ্ডিতগণের চক্রান্তে পরাজিত হইয়া তিনি কালিদাসকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা—কে খণ্ডাইবে? এমন বিদুষী স্ত্রীলাভ করিয়াও কালিদাস সুখী হইলেন না। প্রথম মিলন সময়েই বিদ্যোত্তমার নিকট মেকি ধরা পড়িল। বাহিরে উষ্ট্ররব* শুনিয়া স্ত্রী স্বামীকে "কি ডাকিতেছে" জিজ্ঞাসা করিলেন, কালিদাস উত্তর করিলেন "উষ্ট, উট্"। বিদুষী স্ত্রী ইহা শুনিয়া রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে অধীরা হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করেন। কালিদাসও মরণ পণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে স্বয়ং বীণাপাণি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত অসাধু সংকল্প ত্যাগ করিতে বলিলেন। দেবী প্রসন্না হইয়া বর দিলেন যে তদবধি কালিদাস যাহা বলিবেন, লিখিবেন বা চিন্তা করিবেন তাহাই উৎকৃষ্ট কবিতা হইবে। বাগ্দেবীর প্রসাদে কালিদাস সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এবং সাহিত্যক্ষেত্রে অদ্বিতীয় হইলেন।

* প্রবাদ আছে স্ত্রী স্বামীকে বাস্তবিক পদাঘাত করেন নাই—বরঞ্চ মুর্খের সহিত বিবাহ হইয়াছে বলিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—

উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা ষশ্বা।
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা॥
কিং ন করোতি সএব হি রুষ্টঃ।
কিং ন করোতি সএব হি তুষ্টঃ॥

অর্থাৎ বিধাতার ইচ্ছাতে কিনা হয়—নচেৎ যে মূর্খ "উষ্ট্র" বলিতে একবার "র" এবং একবার "ষ" লোপ করে, তাহারই করে নিবিড়-নিতম্বিনীকে তিনি অর্পণ করিবেন কেন? ইহা শুনিয়া কালিদাসের লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হওয়ায় তিনি ঘোর নিশাকালে স্ত্রীর গৃহ হইতে প্রস্থান করেন।

দয়াময়ী বীণাপাণার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার আদেশক্রমে কালিদাস গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্বিশেষঃ" বলিয়া স্ত্রীকে গৃহদ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। স্ত্রী স্বামীর আলাপে ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উক্ত বাক্যের এক একটী শব্দ লইয়া এক একখানি কাব্য লিখিতে অনুরোধ করিলেন। ইহা হইতে কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ ও ঋতুসংহারের* উৎপত্তি হইল। অতঃপর কালিদাস নানাদেশীয় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া মহতী প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তদীয় গুণ-গ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ সভাসদ ও "নবরত্নের" অন্যতম রত্ন করিয়া নিজ সমীপে রাখিলেন।

কালিদাসের চরিত্রহীনতা সম্বন্ধেও বহুতর প্রবাদ আছে। অনেকে বলেন কবি কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে হরপার্ব্বতীর বিহার যেরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, উহা তাঁহার স্বকীয় চরিত্রের ছায়া মাত্র। কথিত আছে রাজা বিক্রমাদিত্যের রক্ষিতা কোন বারা-ঙ্গনাকে দেখিয়া তাহার প্রণয়াভিলাষে তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠেন। গণিকা তাঁহার কদাকারঃ রূপ দেখিয়া তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিত না। কালিদাস ঐ বেশ্যাকে একবার দেখিবার জন্য প্রতিদিন

* "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্বিশেষঃ" এই বাক্যাংশের প্রত্যেক শব্দ কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ এবং ঋতুসংহারের প্রারম্ভশ্লোকের আদিতে সংযোজিত হইয়াছে যথা—কুমারসম্ভবে—"অস্তি"—উত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা ইত্যাদি।
মেঘদূতে—"কশ্চিৎ" কান্তাবিরহগুরুণা ইত্যাদি।
রঘুবংশে—"বাক্"—অর্থাবিব সম্পৃক্তৌ ইত্যাদি।
ঋতুসংহারে—"বিশেষঃ"—সূর্য্য স্পৃহনীয়শ্চন্দ্রমা" ইত্যাদি।

গৌড়দেশ প্রচলিত পুস্তকে "প্রচণ্ডঃ সূর্য্যঃ" এইরূপ পাঠ লক্ষিত হয়। অস্মদ্দেশ ভিন্ন অন্য দেশীয় পুস্তকে "বিশেষসূর্য্য" এইরূপ পাঠ আছে এবং ইহাই আলংকারিক সম্মত পাঠ।

তাহার বাটীর নিকট পরিভ্রমণ করিতেন। একদা প্রভাতে ঐ গণিকা তাহার বাটীর নিকটস্থ সরোবরের নিকট ভ্রমণ করিতেছিল এমন সময় কবিও তথায় উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘিকাস্থ একটী অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কমল ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে দেখিয়া রমণী উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমিক কবিকে জিজ্ঞাসা করিল—

অনিলস্যাগমো নাস্তি দ্বিপদো নৈব দৃশ্যতে।
বারিমধ্যে স্থিতং পদ্মং কম্পতে কেন হেতুনা॥

কালিদাস বলিলেন—

পাবকোচ্ছিষ্টবর্ণনাং শর্ব্বরী কৃতবন্ধনাৎ।
সূর্য্যমুদ্দিচ্ছতাং কান্তে কম্পতে তেন হেতুনা॥

রমণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল—

কাষ্ঠস্য ভেদনে শক্তি স্তথা বংশগণস্য চ।
অত্যন্তকোমলং পদ্মং ন ভিন্নং কেন হেতুনা॥

কবি উত্তর করিলেন—

পদ্মেন বন্ধনং প্রীত্যা ভ্রমরঃ প্রেমরক্ষকং।
তস্মান্ন ভিদ্যতে কান্তে ভবতা সদৃশং ন হি* ॥

কালিদাসের উদ্দেশ্য সফল হইল। তদবধি গণিকার প্রেম লাভ করিলেন। রাজারও কতকটা সন্দেহ না হইয়াছিল এমন নহে। একদা যখন কালিদাস উক্ত গণিকাগৃহে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন সেই সময় হঠাৎ রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন। রমণী

* কথিত আছে কবি ও তাঁহার পত্নীতে এরূপ কথোপকথন হইয়াছিল। পত্নী যে তাঁহার প্রতি অপ্রেমিকার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে কবি তৎপ্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করেন। "কান্তে ভবতা সদৃশং ন হি" অর্থাৎ প্রিয়ে ভ্রমর প্রেমরক্ষক; সে তোমার মত নিষ্ঠুর অপ্রেমিক নহে। এতদ্ভিন্ন "কান্তে" এই সম্বোধনেই ইহা আরও স্পষ্টীকৃত হয়।

ভীতা ও অনন্যোপায় হইয়া কবিকে শয্যাস্তূপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। বারাঙ্গনাকে ত্রস্ত ও বিবসনা দেখিয়া রাজা তাহার অনাবৃত পয়োধরযুগলে হস্তার্পণ করিয়া রহস্যের সহিত কহিলেন,—

তব তন্বি কুচাবেতৌ নিয়তৌ চক্রবর্ত্তিনৌ।

অর্থাৎ হে তন্বি! তোমার পয়োধরদ্বয় নিয়তই চক্রবর্ত্তী সম্রাট-রূপে বিরাজিত। ইহা শুনিয়া কি কালিদাসের ন্যায় সুরসিক কবি স্থির থাকিতে পারেন? বিশেষতঃ রাজা কবিতার শেষ চরণ মিলাইতে পারিতেছেন না। কবি ভাবিলেন মৃত্যুও শ্রেয়ঃ তথাচ শ্লোকের শেষ চরণ পূরণ করিতেই হইবে। কবি গুপ্তস্থান হইতে বেগে বাহির হইয়াই বলিলেন—

আসমুদ্র করগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ॥

আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন; কেননা সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূভাগের করগ্রাহী সম্রাট আপনি যাহাতে কর দিতেছেন, তখন ইহারা চক্রবর্ত্তী না হইবে কেন? এখানে "কর" শব্দটী দ্ব্যর্থব্যঞ্জক—এক অর্থে কর অর্থাৎ রাজস্ব (খাজানা) অপরার্থে হস্ত। রাজা কবিতা শুনিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে তিনি কবিকে সে যাত্রা ক্ষমা করিলেন। অবশেষে বেশ্যাগৃহেই কালিদাসের মৃত্যু ঘটে।*

* প্রবাদ আছে, কালিদাস সশরীরাবির্ভূতা বাণীর নিকট বর পাইয়াই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করেন। শাস্ত্রানুসারে দেবতাদিগের চরণ হইতে এবং মনুষ্যদিগের কেশ হইতে বর্ণনা করিতে হয়। কালিদাস কিন্তু বীণাপাণির কুচদ্বয় হইতে (কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে প্রভৃতি) বর্ণনারম্ভ করেন। বাগ্‌দেবী ইহাতে অতিশয় রোষান্বিতা হইয়া তাঁহার বেশ্যালয়ে মৃত্যু হইবে বলিয়া শাপ দেন। অপর মতানুসারে কালিদাস জগন্মাতা দুর্গার বরে সর্ব্ববিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। এ সম্বন্ধেও একটী জনশ্রুতিমূলক আখ্যায়িকা আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা দেওয়া হইল না।

এই জনশ্রুতি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। কালিদাসের জীবনী কেন এরূপভাবে চিত্রিত আছে তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার গ্রন্থপাঠে কেহই তাঁহাকে লর্ড বায়রণের ন্যায় দাম্ভিক, উচ্ছৃঙ্খল বলিতে পারেন না। সত্য বটে তাঁহার রচনায় স্থানে স্থানে অনেক অশ্লীল কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি "জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ" লিখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে নীতিহীন বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয় না। যিনি "অনার্য্য খলু পরদার স্পৃহাব্যাপারঃ" লিখিতে পারেন তাঁহাতে মলিনতা সম্ভবে না। আমরা দেখিতে পাই ঈশ্বরাবতার যিশু শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছেন—"যাহারা ইচ্ছা করিয়া প্রলোভনের সম্মুখীন হয় তাহারা মূর্খ"। কিন্তু কালিদাস বলিয়াছেন—"যাঁহার চিত্তবিকারের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত বিকৃত হয় না তিনিই ধীর"। নিজের চরিত্রবলে বিশ্বাস না থাকিলে একথা লেখা সম্ভব বোধ হয় না।

কালিদাসের গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি কবি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কবির হিমালয় বর্ণনা তাহার প্রমাণ স্থল। "হিমালয়ের একস্থানে মেঘ সঞ্চারিত হইতেছে; বৃষ্টি দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া তাপসগণ শৈলশৃঙ্গের উৰ্দ্ধভাগে আশ্রয় লইতেছেন" ইহা স্বচক্ষে না দেখিয়া কখন লিখিতে পারা যায় না। যাঁহারা পাৰ্ব্বত্যদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, শৈলের অধোদেশে মেঘসঞ্চার হইলেও উৰ্দ্ধভাগ সৰ্ব্বদা সূর্য্যালোকে আলোকিত থাকে। কবিকৃত সমুদ্রবর্ণনা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে তিনি সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে প্রয়াগের গঙ্গাযমুনা সঙ্গমস্থান ও হরিদ্বার পর্য্যন্ত কবি যে ভ্রমণ

করিয়াছিলেন, রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ ও মেঘদূত পাঠ করিলে তাহা বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না। রঘুবংশের ষোড়শ সর্গ পাঠে প্রতীতি হয়, কালিদাস যেন অযোধ্যাপুরীর কোন ভগ্নস্তূপে বসিয়া অযোধ্যার পূর্ব্বসমৃদ্ধি ও পরবর্ত্তী শোচনীয় অবস্থার আলোচনা করিতেছেন।

কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গে গৌরীর পঞ্চতপ বর্ণিত হইয়াছে। কেহই উমাকে বাধা দিয়া নিরস্ত করিতে পারিলেন না দেখিয়া কবি বলিয়াছেন—"কঃ ঈপ্সিতার্থ স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভি-মুখং প্রতীপয়েৎ"। কবি এই উক্তি দ্বারা যেন নিজ জীবনের ঘটনাবিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। সম্ভবতঃ নিজের বিদ্যোপার্জ্জন ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলিয়াছেন। বোধ হয় বাল্যকালে প্রতিকূল ঘটনাবশে বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই, পরে গৃহত্যাগ করিয়া বিদেশে নিজের আন্তরিক চেষ্টায় ও যত্নে অশেষ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক ইহা আমাদের অনুমান মাত্র। দৃঢ়তার সহিত একথা বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

কালিদাস দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত ছিলেন একথা তাঁহার লেখার কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তিনি যে এ সুখে সুখী ছিলেন ইহাই ধারণা হয়। তাঁহার লেখার কোন স্থানে নিরাশ প্রণয়ের কথা নাই। বরং অনেক স্থলে স্ত্রীবিরহে কাতরতা প্রকাশ আছে।

প্রবাদ অনুসারে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নিকট অর্দ্ধরাজ্য দান পাইয়াছিলেন। কিন্তু কবি যে হীনাবস্থার লোক ছিলেন, দারিদ্র্যদোষ যে তাঁহার ছিল, তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠ করিয়া বুঝিতে

পারা যায়। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সাধারণতঃ যেরূপ অভিমানী ও তেজীয়ান্ কালিদাসও সেইরূপ ছিলেন বোধ হয়—কেননা মহতের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হইতেও তিনি সম্মত ছিলেন তথাপি অধমের নিকট প্রার্থনা করিয়া সিদ্ধকাম হইতেও তাঁহার অভিলায ছিল না।

কালিদাস জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন—তাঁহার গ্রন্থ হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। চন্দ্রের কলাবৃদ্ধি বা পুষ্টি যে সূর্য্য-কিরণ হইতে হয় তাহা তিনি বলিয়াছেন। চন্দ্রের উদয়ে যে সমুদ্রের জোয়ার হয় তাহা তাঁহার জানা ছিল। উল্কাপিণ্ড হইতে পৃথিবীতে বীজ উপ্ত হইয়াছিল একথাও তিনি বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ফলিতঃ জ্যোতিষে যে তাঁহার অসামান্য জ্ঞান ছিল তাহারও ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়।

কালিদাসের অলৌকিক প্রতিভা যে একমাত্র কাব্যশাস্ত্রেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তিনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাণ, তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। কুমার ও রঘুতে ব্রহ্মা ও নারায়ণের স্তব আছে। তৎপাঠে বুঝিতে পারা যায়, কবি একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। ব্রাহ্মণধর্ম্মের সারমত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কৈবল্য যোগ বিনা যে মুক্তি নাই তাহা তিনি বলিয়াছেন। অবতারবাদে তাঁহার বিশ্বাস ছিল দেখা যায়। ভক্তি যে মুক্তির পথ তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন।

কেহ কেহ বলেন কালিদাস শৈব ছিলেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যখন উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য শৈব ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে তখন তাঁহার সখা কালিদাসেরও সেই মতাবলম্বী

হওয়া সম্ভব। নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন, জ্যোতির্বিদাভরণে এরূপ উল্লেখ আছে। বুদ্ধগয়ার শিলালিপিতেও অমরসিংহকে বৌদ্ধ বলা হইয়াছে। কালিদাসের ধর্ম্মমত অন্যরূপ থাকিলে সম্ভবতঃ তাহার উল্লেখ থাকিত। যাঁহারা কালিদাসকে শৈব বলেন তাঁহাদের মত খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্তবে এক ঈশ্বরেরই মূর্ত্তিভেদ কল্পনা করিয়াছেন। রঘুবংশের প্রথমে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা করিলেও শকুন্তলায় কবি একমাত্র ঈশ্বরের স্তুতি করিয়াছেন। যাহা হউক ইহা নিশ্চয় যে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন।

প্রবাদ অনুসারে এবং জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে আস্থা স্থাপন করিলে, কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ও সখা ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস হয়। এই বিক্রমাদিত্য যেরূপ ধৈর্য্য, ঔদার্য্য ও সহৃদয়তা সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী কোন রাজাই গুণ-গরিমায় তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মে যে কালিদাস অতিশয় ধীর, শান্ত ও সহৃদয় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় লোক যে কূটনীতির পক্ষপাতী থাকিতে পারেন তাহা বিশ্বাস হয় না। কবির আশ্রয়-দাতা ও প্রতিপালক বিক্রমাদিত্যও কূটনীতি-বিশারদ ছিলেন না। প্রবাদ অনুসারে তাঁহার ঔদার্য্য ও সত্যপ্রিয়তা তাঁহার ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া সত্য হইতে বিচলিত হইতেন না।

কালিদাসের গ্রন্থ পড়িয়া আমাদেরও মনে হয় তিনি কখনও গুরুজনের আজ্ঞা অবহেলা করিতেন না, কেন না "আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া" তাহা হইলে তিনি লিখিতে পারিতেন না। অতি

প্রিয়জনও দোষী হইলে যে পরিবর্জ্জনীয় হয় তাহাও কালিদাস বলিয়াছেন—"ত্যাজ্যোদুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীৎঅঙ্গুলীবোরগক্ষতা"। "ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্"। যে ব্যক্তি নিন্দা করে কেবলমাত্র সেই যে পাপভাগী হয় তাহা নহে যে ব্যক্তি শুনিয়া থাকে তাহাকেও পাপস্পর্শ করে কবি ইহাও লিখিয়াছেন। এইমাত্র পাঠ করিলেই কবির কিরূপ উচ্চ হৃদয় ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক কালের ব্যক্তিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য আর একটী কথা কবি বলিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"। শরীর না সুস্থ থাকিলে ধর্ম্মসাধন হইতে পারে না। তাঁহার রাজনীতিজ্ঞানও উদারতামূলক, কেননা কবি বলিয়াছেন—"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম সাম্প্রতম্"।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন অভিজ্ঞান-শকুন্তলার বয়স্তচিত্রে কবি নিজ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমতের অনুকূলে বা প্রতিকূলে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এ মতে শ্রদ্ধাবান হইবার কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়। কেননা সচরাচর অলঙ্কারের নিয়মানুসারে বিদূষক চরিত্র চিত্রিত হয়; শকুন্তলায় অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞতার পরিচয় আছে।

কয়েকটী প্রবাদ এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। কালিদাস দরিদ্র হইলেও তাঁহার দানশক্তি অতি প্রবলা ছিল। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইত। কোন সময়ে তিনি মধ্যাহ্নকালে গ্রামান্তর হইতে স্বগৃহে আসিতেছিলেন। একে গ্রীষ্মকাল তাহাতে মধ্যাহ্ন সময়। পথের বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিকণার ন্যায় বোধ হইতেছিল। এমন সময়ে কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নগ্নপদে সেই বালুকারাশি অতিক্রম করিতে দেখিয়া

কালিদাসের মন গলিয়া গেল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজের জীর্ণ পাদুকা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে দিয়া তাঁহার কষ্ট নিবারণ করিলেন। নিজে কিরূপে সে পথ অতিক্রম করিবেন তাহা একবারও চিন্তা করিলেন না। কিন্তু ভগবানের এমনি কৃপা যে ঠিক সেই সময়েই কালিদাসকে রাজভবনে লইয়া যাইবার জন্য রাজকীয় লোক অশ্ব লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া কালিদাস ভাবিলেন বিধাতার কি আশ্চর্য্য বিধান! জীর্ণ পাদুকা দান করিয়া যখন অশ্বলাভ ঘটিল, তখন পৃথিবীতে আসিয়া যাহা দান না করা যায় তাহাই ত নষ্ট হয়। তিনি অমনই কবিতা রচনা করিলেন

দ্বিজায় দত্তা পাদুশ্চ শত-বর্ষীয়-জর্জ্জরা
তৎফলাদশ্বলাভোমে তন্নষ্টং যন্নদীয়তে॥

কালিদাসের দারিদ্র্যলক্ষ্য করিয়া ঘটকর্পর বলিয়াছিলেন—

অঙ্কস্থ দোষো গুণাসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দো রিতি যো বভাষে।
নুনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্রদোষো গুণরাশি নাশী।

কুমারসম্ভবে কালিদাস হিমালয়-বর্ণন কালে লিখিয়াছেন—"হিমালয় অশেষ রত্নের আকর সুতরাং কেবল হিমের জন্য তাহার সৌভাগ্য বিলোপ হইতে পারে না; কেননা যাহার সমূহ গুণ থাকে তাহার একটী মাত্র দোষ চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় ধর্ত্তব্যই হয় না*"।

* কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গের তৃতীয় শ্লোকে কালিদাস লিখিয়াছেন—
অনন্তরত্ন প্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্য বিলোপিজাতম্।
একোহি দোষঃ গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্ক॥

ইহাতে ঘটকর্পর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী দ্বারা কালিদাসের এবং নিজের দারিদ্র্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এক দারিদ্র্য দোষে যে গুণ সমূহ ঢাকিয়া রাখিতে সমর্থ তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

ঘটকর্পরকৃত শ্লোকের যাথার্থ্য কালিদাসকে বুঝাইবার জন্য একদিন বররুচি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কালিদাসের মাতার নিকট নির্ব্বন্ধের সহিত অনুরোধ করিলেন যে, "পরদিন রাজসভায় গমন কালে তিনি কালিদাসকে যেন বলেন, গৃহে তণ্ডুল নাই।" কালিদাসের মাতা স্বীকৃতা হইলেন। এবং পরদিন কালিদাসের রাজভবন গমন কালে গৃহে তণ্ডুলের অভাব জানাইলেন। সেদিন আর কালিদাসের মন প্রফুল্ল রহিল না। কাজেই কবিতা রচনা বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন ঘটকর্পর বলিলেন—

দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ।
অন্নচিন্তা চমৎকার-কাতরে কবিতা কুতঃ॥

কেহ কেহ বলেন কালিদাসের ঔদাসীন্য দেখিয়া বিক্রমাদিত্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কালিদাস নিজেই উক্ত শ্লোকটী রচনা করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন।

কালিদাসের যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইলে অনেক

ইহার উত্তরে নাসিকের অনেক প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কালিদাসের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন —

"একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দো" রিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি-নাশী॥

এই শ্লোক কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া ঘটকর্পরের নামে প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ ইহার মূলতত্ত্বের রহস্যোদ্ঘাটনে আমরা অসমর্থ।

পণ্ডিত ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার সহিত বিচারপ্রার্থী হইয়া আগমন করিতেন। কালিদাস তাঁহাদিগকে নিরাশ করিবার জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করিতেন। কখনও ধীবরকন্যা সাজিয়া,—কখনও গোয়ালিনী,—কখনও পরিচারিকা বেশে তাঁহাদের নিকট যাইয়া শ্লোকচ্ছটায় বিচারপ্রার্থী পণ্ডিতগণের মনে ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেন। পণ্ডিতগণ কালিদাসের সহিত রাজসভায় আর বিচার করিতে সাহসী না হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। কখনও বা ধূর্ত্ত লম্পটবেশে কালিদাস দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণকে বিড়ম্বনা করিতেন। এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে—

ভিক্ষামাংসনিষেবনং প্রকুরুষে কিংতত্রমদ্যং বিনা।
মদ্যঞ্চাস্তি তব প্রিয়ং প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ॥
বেশ্যাপ্যর্থরুচি কুতস্তবধনং দ্যূতেন চৌর্য্যেন বা।
চৌর্য্যদ্যূত পরিগ্রহোঽস্তি ভবতো নষ্টস্য কান্যা গতিঃ* ॥

* এই শ্লোকটী সামান্য রূপান্তরিত হইয়া কালিদাস ও তাঁহার পত্নীর বাদানুবাদরূপে প্রচারিত হইয়াছে। কথিত আছে স্বামীকে মূর্খ দেখিয়া স্ত্রী তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। একদা কবি উষ্ট্র উচ্চারণ করিতে "ষ" ও "ব" লোপ করায় কবিপত্নী—"উষ্ট্রে লুম্পতি রংবা ষংবা"—ইত্যাদি শ্লোক বলেন। কালিদাস এইজন্য স্ত্রীকে ভৎর্সনা করায় তিনি বিরক্তি সহকারে বলেন, "নষ্টস্য কান্যা গতিঃ।" ইহা কবির মনে জাগরুক ছিল। পরে তিনি যশস্বী হইলে একদা ছদ্মবেশে জলাশয়ের তীরে বসিয়া মাংসাহার করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সেই ঘাটে স্নানার্থ উপস্থিত হইলে "শার্দূলবিক্রীড়িত-বৃত্তে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইল"।

স্ত্রী। ভিক্ষো মাংস নিষেবনং প্রকুরুষে
কালি। কিং তেন মদ্যং বিনা॥
স্ত্রী। মদ্যং চাপি তব প্রিয়ং
কালি। প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ॥

কালিদাস কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নিকট কিঞ্চিৎ মাংস ভিক্ষা করিলেন। পণ্ডিত বলিলেন—"তুমি কি ভিক্ষা করিয়া মাংস আহার কর।

উত্তর। মদ্য না হইলে কেবল মাংসে কি হয় ?

প্রশ্ন। কি তুমি মদ্য পান কর ?

উত্তর। হাঁ কিন্তু বারাঙ্গনার সহিত।

প্রশ্ন। বেশ্যা অর্থপ্রিয়া, তোমায় অর্থ কোথায় ?

উত্তর। দ্যূতক্রীড়া অথবা চৌর্য্য দ্বারা ধন সঞ্চয় হয়।

প্রশ্ন। তোমার কি চৌর্য্য প্রভৃতি পরিগ্রহ আছে ?

উত্তর। নষ্ট লোকের আর অন্য গতি কি ?

সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ইহা শুনিয়াই প্রস্থান করিলেন। কেননা সামান্য লম্পট যেখানে এতবড় পণ্ডিত সেখানে কালিদাস কতবড় লোক হইবেন।

কথিত আছে কালিদাসকে পরাজয় করিতে সমর্থ না হইয়া ঈর্ষাবশতঃ কোন কোন পণ্ডিত কালিদাসের পিতার অবমাননা করিয়া প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেন। কালিদাসের পিতা তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না। এজন্য সকলেই তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কালিদাস এরূপ

স্ত্রী। বেশ্যা ত্বয়ারুচি কৃতস্তব ধনং
কালি। দ্যূতেন চৌর্য্যেন বা।
স্ত্রী। দ্যূতাশ্চৌর্য্য পরিগ্রহোঽপি ভবতা
কালি। "নষ্টস্য কান্যা গতিঃ"॥

স্ত্রী এইরূপে নিজোক্তিদ্বারা প্রত্যুত্তর প্রাপ্তা হইয়া এবং স্বামীকে চিনিতে পারিয়া লজ্জায় ম্রিয়মানা হইলেন।

সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতেন যে কেহই নিজ মন্দাভিলাষ সিদ্ধ করিবার অবসর পাইতেন না। পিতা কোন অসংলগ্ন কথা বলিলেও পুত্র তাহার সঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। এরূপ পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠেও বুঝিতে পারা যায় তিনি কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন। প্রবাদেও তাহা সমর্থিত হয়।

প্রবাদ আছে কোনও সময়ে কালিদাসের অনুপস্থিতি কালে কালিদাসের পিতাকে অপ্রতিভ করিবার ইচ্ছায় কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহাকে কোন শাস্ত্রবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কালিদাসের পিতা তাহার উত্তর প্রাকৃত বা প্রচলিত ভাষায় দিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে উপহাস করিতে থাকেন। ইত্যবসরে কালিদাস তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পিতৃদেব কথিত প্রাকৃত শব্দ লইয়া এমন সুন্দর সংস্কৃত কবিতা রচনা করিলেন যে সকলে তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন।

কথিত আছে কোনও সময়ে বিক্রমাদিত্যের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া কালিদাস উজ্জয়িনী ত্যাগ করিয়া কর্ণাট রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তথায় কর্ণাট রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু এ প্রবাদ আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতে পারি না।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভোজ নামক কোন নরপতি উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। কেহ বলেন তিনি বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর ছিলেন। তাঁহার সভা শ্রুতিধর পণ্ডিতগণে পূর্ণ ছিল। কেহ আসিয়া রাজসভায় নূতন শ্লোক বলিলে সভাসদ পণ্ডিতগণ তাহা এরূপ আয়ত্ত করিতেন যে পূর্ব্বাধীত কবিতার

ন্যায় অনর্গল তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া আগন্তুক কবি বা পণ্ডিতকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন। এজন্য ভোজরাজ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, যে কেহ আসিয়া তাঁহার সভায় নূতন কবিতা বলিবে সে ব্যক্তি লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন। কোন পণ্ডিত উক্ত পারিতোষিক লাভে সমর্থ না হওয়ায় কালিদাস ভোজরাজকে বঞ্চনা করিবার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি সভায় উপস্থিত হইয়া ভোজরাজকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কবিতাকারে এই কথাগুলি বলিলেন—

> স্বস্তি শ্রীভোজরাজস্ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিক সত্যবাদী।
> পিত্রা তে গৃহীতং পূর্ব্বং রত্নকোটী মদীয়ং॥
> দেহিতাং তূর্ণং সকল বুধজনৈঃ জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ।
> ন বা জানাতি নবকৃতমিতি চেৎ দেহি লক্ষং ততোমে॥

"মহারাজের কল্যাণ হউক। আপনার পিতা পূর্ব্বে আমার নিকট কোটী স্বর্ণমুদ্রা ঋণ লইয়াছিলেন; আপনার সভাসদগণ তাহা অবগত আছেন। আর যদি তাঁহারা অবগত না থাকেন তবে নূতন শ্লোক রচনার পারিতোষিক লক্ষ মুদ্রা আমাকে দিতে আজ্ঞা হউক"। সভাস্থ সকলেই শ্লোক শুনিয়া অবাক। কথা কহিলে কোটী মুদ্রা না কহিলে লক্ষমুদ্রা কাজেই পণ্ডিতগণ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

কালিদাসের পুত্র কন্যা হইয়াছিল কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এসম্বন্ধে কোন প্রবাদ আমরা অবগত নহি।

কালিদাসের অপমৃত্যু অর্থাৎ বেশ্যাগৃহে মৃত্যু হওয়া সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতে পারি না।

"শান্তিশতক" প্রণেতার পুত্রবধূ যেরূপ বিড়াল মিথুন দেখিয়া

শ্বশুরকে শুনাইয়া তাহাদিগকে "শান্তিশতক" পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন কালিদাসের কন্যা সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রবাদ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অনেকানেক পণ্ডিত ঐ প্রবাদ শান্তিশতক প্রণেতার পুত্রবধূ সম্বন্ধেই উল্লেখ করিয়া থাকেন। মূল কথা এই যে শান্তি-শতক পড়িয়া পুত্র যুবতী ভার্য্যার প্রতি অনাসক্ত হওয়ায় পুত্রবধূ বিড়াল মিথুনকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে বলেন। তদবধি তিনি পুত্রকে কুমার প্রভৃতি কাব্য পড়িতে অনুমতি করেন। পুত্রও স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হন।

কালিদাসের রচনা প্রণালী।

সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে কালিদাসের রচনা যেরূপ বিশদ ও প্রাঞ্জল আর কাহারও সেরূপ নহে। অন্যান্য কবিগণ যেরূপ দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস ঘটিত পদ ব্যবহার করিয়াছেন, কালিদাস তাহা করেন নাই। কালিদাসের লেখায় অযথা অলঙ্কার-পরিপাট্য বা উৎকট অতিশয়োক্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই জন্য তাঁহার রচিত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আদর্শ স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। কালিদাসের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি একটী শ্লোক লিখিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকের জন্য আদৌ চিন্তা করেন নাই। যদিও সংস্কৃত ভাষা তাঁহার সময়ে বাক্য কথনে প্রচলিত ছিল না, যদিও কালিদাসের বহু পূর্ব্ব হইতে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হইত, তথাপি কালিদাসের রচনা পাঠ করিয়া বোধ হয় তিনি যেন মাতৃভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। লিখিতে বসিয়া তিনি বিনা আয়াসে ভূরি ভূরি শ্লোক রচনা করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহার লেখায় বিশেষত্ব

এই যে শব্দ বিন্যাস কালে তিনি কোথাও অনাবশ্যকীয় বা পরিবর্ত্ত সহ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার ভাষা ও ভাব জলপ্রপাতের ন্যায়। অজস্র প্রবাহিত হইলেও কোন স্থানে অপচয়ের দিকে যায় নাই। অনেক কবি নিজ নিজ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইয়া অনেক স্থানে অযথা প্রয়োগ (একঘেয়ে বর্ণনা) করিয়া নিজ নিজ রচনাশক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। সে সকল স্থান পড়িতে পাঠক মাত্রেরই বিরক্তিকর হয়। কিন্তু কালিদাসের লেখায় কোন স্থানে সেরূপ দোষ লক্ষিত হয় না। উৎকট অতি-শয়োক্তি কালিদাসের লেখায় স্থান পায় নাই।

কালিদাস স্বভাব বর্ণনে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন কালিদাস প্রকৃতিকে প্রকৃতচক্ষে দেখিয়াছিলেন। চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী হৃদয় মন প্রফুল্লকর দৃশ্য অঙ্কিত করিতে কালিদাস অতিমাত্র নিপু-ণতা দেখাইয়াছেন। "শান্তমিদং আশ্রমপদং" পড়িলে মনে যেরূপ শান্তি রসের আবির্ভাব হয় তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কালিদাসের লেখার অনেক স্থান স্বভাবোক্তিতে পরিপূর্ণ। ঋতু-সংহার, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা সকল কাব্যেই স্বভাব বর্ণনা আছে। সে সকল বর্ণনা এতই স্বাভাবিক যে পড়িবা মাত্রই মনকে স্নিগ্ধ করে—মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। আদি, করুণ ও শান্ত রসের বর্ণনায় সংস্কৃত কবিগণ যেরূপ নিপুণতা দেখাইয়াছেন, বীর বা রৌদ্র রসের অবতারণায় তাঁহারা সকলে সেরূপ কৃতকার্য্য হন নাই। একমাত্র ভারবি ভিন্ন অন্য কেহ বীর-রসের বর্ণনায় সিদ্ধ কাম নহেন। বিশেষতঃ যে সকল বর্ণনায় মনে ভয় ও ভক্তির আবির্ভাব, হয় সেরূপ বর্ণনা কালিদাসের লেখায় দেখা যায় না। হিমালয় ও সমুদ্রের বর্ণনায় কবি কেবল মাত্র

তত্তৎ স্থানের জীবগণের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সে সকল দেখিলে মনে যেরূপ গম্ভীর ভাবের উদয় হয়, কবি তাহার উল্লেখ করেন নাই; তৎপরিবর্ত্তে পৌরাণিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া ঐ সকল বর্ণনার সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছেন। পৌরাণিক জ্ঞানে পটুতা দেখান কবির যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, গম্ভীর বর্ণনা দ্বারা মনে ভয়, ভক্তি ও ঔদাস্যের আবির্ভাব করা কবির তাদৃশ লক্ষ্য ছিল না। সেই জন্য কবি সম্ভবতঃ হিমালয় ও সমুদ্রের বর্ণনায় স্থলচর ও জলচর জীবগণের উল্লেখ ও পৌরাণিক ঘটনা বিবৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

মনুষ্য চরিত্র চিত্রণে কালিদাস অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। মনুষ্য চরিত্রের প্রত্যেক অংশ তিনি অতিমাত্র নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। যেমন সুযোগ্য রাসায়নিক পণ্ডিত কোন পদার্থের প্রত্যেক অংশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া থাকেন, সেইরূপ কালিদাসও মনুষ্যমনের প্রত্যেক গূঢ়তম অংশ চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। মানব হৃদয়ের প্রত্যেক রহস্যই যেন তাঁহার মনো-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইত। মনুষ্যের মনোবৃত্তির ক্রমবিকাশ অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় কোন কবি একাধারে কবিত্বশক্তি, রচনাচাতুর্য্য ও চরিত্র চিত্রণ পটুতা দেখাইতে পারেন নাই। কোন কবি সকল বিষয়ে এরূপ সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। কালিদাসের সৃষ্টি-ক্ষমতার তুলনা হয় না। পরিচয় দিয়া সম্যক্ বুঝাইবার চেষ্টা করাও বৃথা। তাঁহার গ্রন্থ উত্তমরূপ অধ্যয়ন না করিলে বুঝিতে পারা যায় না যে তিনি কিরূপ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কবি ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির পরিচয় প্রদান কালে সাধ্যমত এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কবিগণের সৃষ্টিক্ষমতা বা উদ্ভাবিনী শক্তির কথা বলিলে অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে না যে তাঁহারা কোন নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। জগতে যাহা চিরকাল রহিয়াছে তাহা লইয়াই তাঁহাদের বাণিজ্য। নহিলে একটী সামান্য পরমাণুও তাঁহারা নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন না। একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন সে ক্ষমতা আর কাহারও নাই। তবে যে সকল উপাদান বিদ্যমান আছে, সেইগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া—সেইগুলির সংযোগ-বিশ্লেষণ করিয়া কবিগণ নিজ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সংযোগ বা মেলন কার্য্যে এবং আবশ্যক মত বিয়োগ ঘটাইতে যিনি অধিক পটু তিনিই অসাধারণ ক্ষমতাশালী কবি, নহিলে কেবল ছন্দোবন্ধে কবিত্ব প্রকাশ পায় না। বাল্মীকি ও ব্যাসের কবিতা রচনা সময় যে সকল উপকরণ ছিল, কালিদাস ও ভবভূতির সময়ও তাহাই ছিল; হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সময় তাহাই আছে। অথচ সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া নিজের মনোমত সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। কবির কল্পনা ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ হইতে সারসংগ্রহ করিয়া থাকে। কল্পনার গতি অব্যাহত। কি অভ্রভেদী হিমাচল শিখর, কি অতলস্পর্শ সমুদ্রগর্ভ, কি বিমানমার্গ, কি সৌর-জগৎ—কবির কল্পনা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত ভাবে বিচরণ করিয়া সৌন্দর্য্য আহরণ করিতেছে। পরে তাহা হইতে সংযোগ মেলন বা বিশ্লেষণ করিয়া অভিনব এক একটী বিষয়ের সৃষ্টি করিতেছে, নহিলে নূতন উপকরণ লইয়া, নূতন পরমাণু সৃষ্টি করিয়া কবিগণ কাব্য জগতের নূতন চিত্র অঙ্কিত করেন না। যাহা চিরকাল রহিয়াছে তাহা হইতেই সমস্ত সংগ্রহ করিতে হয়। তবে কবির চক্ষু স্বতন্ত্র। ক্ষুদ্র বৃহৎ, সুন্দর কুৎসিত, ভয়ানক ও

কৌতুকপ্রদ সকল বস্তুই তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত হয়। তিনি একবার যাহা দেখেন তাহা আর বিস্মৃত হন না। অতি ক্ষুদ্র ও অতি তুচ্ছ সামগ্রীও কবির নিকট উপেক্ষিত হয় না। যেটী সকলেই দেখিতেছে অথচ লক্ষ্য করিতেছে না, কবি সেটীকে এমনই সুন্দর, এমনই মনোহর ভাবে সাধারণের সম্মুখে বাহির করেন যে তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কালিদাসের এই শক্তি পূর্ণ মাত্রায় ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরিচয় দ্বারা ইহা বুঝান নিতান্ত অসম্ভব। কালিদাসের প্রত্যেক কাব্যে এই শক্তির পূর্ণ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

আর এক কথা। এই প্রকার শ্রেষ্ঠতম কবিত্বশক্তির সহিত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। যে কাব্যে তাহার অভাব, সে কাব্য অপাঠ্য না হইলেও মনোমধ্যে স্থায়ী ভাব বা ব্যাপার আনিয়া দিতে সমর্থ হয় না। যাহা কবিত্বাংশে উৎকৃষ্ট —কাব্য ধর্ম্মনীতি অনুসারেও তাহা উৎকৃষ্ট সামগ্রী। জগতের আদি কবির প্রথম কবিতা পরদুঃখকাতরতা প্রকাশ করিয়াছিল। কালিদাসের রচনার সকল স্থানেই উচ্চ ধর্ম্মনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মেঘদূতের দু'এক স্থান কেহ কেহ আপত্তিজনক মনে করিতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য কাব্য নাটকাদিতে ধর্ম্মনীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় সকল স্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত কাব্যাদিতে হাস্যরসের তাদৃশ পরিচয় পাওয়া যায় না। নাটকীয় বিদূষক চরিত্র হাস্যরসের অবতারণার জন্য সৃষ্ট হইলেও সে হাসি উত্তমরূপ তৃপ্তিপ্রদ হয় না। প্রাচীন আর্য্যগণ যে হাসিতে জানিতেন না, ইহাই যেন সিদ্ধান্ত করিতে হয়। বোধ হয় হাস্য-রসের অবতারণা নিয়মবদ্ধ হওয়ায় কবিগণ সে রসের তাদৃশ পরিচয়

দিতে পারিতেন না। নহিলে কালিদাসের লেখার অনেক স্থানে তাঁহার রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দুমতীর সখী সুনন্দা, উর্ব্বশীর সখী চিত্রলেখা, শকুন্তলার ও বিক্রমোর্ব্বশীর বিদূষক সকল-কেই হাসাইতে নিপুণ। তবে সে হাসি যেন ভালরূপ বিকাশ পায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐশ্বরিক ও দার্শনিক গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকায় বোধ হয় ভালরূপ হাসিতে ভালবাসিতেন না। যাহা হউক স্বভাব একেবারেই পরিবর্ত্তিত হয় না। এইজন্য নিয়মবদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাসের রসজ্ঞতা বিলক্ষণ ছিল। যদি "শৃঙ্গারতিলক" কালিদাস-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করা যায়—তাহা হইলে তিনি যে হাসিতে ও হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন তাহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হয়। তাঁহার লেখায় হাস্যরসের ছড়াছড়ি না থাকিলেও রচনা যে সর্ব্বত্র সরস ও প্রফুল্লকর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কুমারসম্ভব।

কালিদাসের পূর্ব্বে আর কোন কবি সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি না জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ কালিদাস সর্ব্বপ্রথম মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এবং সেই প্রথম মহাকাব্যই এই কুমারসম্ভব। এই মহাকাব্য যে রঘুবংশের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, উভয় কাব্যের রচনা প্রণালী আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যখন কালিদাসের কল্পনা আর খণ্ডকাব্যাদিতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, পৌরাণিক বিষয়-গুলিরবস্তুগত চমৎকারিত্ব দেখিয়া তদপেক্ষা মনোহর বস্তু সৃষ্টি

করিতে তাঁহাকে প্রণোদিত করিতেছে, সেই সময় কালিদাস মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ সময় কবি কি বর্ণনা, কি চরিত্র অঙ্কন—সর্ব্ব বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও তাঁহার প্রবীণতা আইসে নাই; সেইজন্য কুমারসম্ভবে আমরা আদিরসের একটু মাত্রাধিক্য দেখিতে পাই।

কুমারসম্ভবের উপাখ্যানভাগ শিবপুরাণ হইতে সংগৃহীত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু এক্ষণে যে শিবপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা অধিক প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে হয় না। পুরাণগুলি ব্যাসদেব রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু সেগুলি যে এক লেখনী নিঃসৃত নহে তাহা নিশ্চয়। কেননা একই গল্প বিভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত দেখা যায়। বিশেষতঃ যখন বিষ্ণুপুরাণে খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর রাজবংশের উল্লেখ দেখা যায়, তখন সে বিষয় যে উক্ত সময়ের পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই তাহা বিশ্বাস হয়। এইরূপে মৎস্য ও বায়ুপুরাণে অনেক রাজবংশের উল্লেখ আছে। সুতরাং অধিকাংশ পুরাণই যে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত তাহা অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন পুরাণগুলিতে "অত্রো-চ্যতে" বলিয়া যে সকল উদ্ধৃত অংশ দেখা যায় তাহাই মূল পুরাণের অংশ। পরবর্ত্তী লেখকগণ ঐ সকল উক্তি ভিত্তি করিয়া—নানা গল্প, নানা ভাবে পুরাণগুলির মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শিবপুরাণে উল্লিখিত গল্পাংশের সহিত কুমারসম্ভবে বর্ণিত আখ্যানের সম্পূর্ণ মিল আছে। এমন কি শ্লোকগত ঐক্যও দেখা যায়। কিন্তু মহাকবি কালিদাস যে নিজ রচিত গ্রন্থে অন্যদীয় পুস্তক হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশিত করিতে পারেন

এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। কালিদাস বলিয়া কেন আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কখনই এ কার্য্য করিতে পারেন না। এজন্ম আমাদের বিশ্বাস প্রচলিত শিবপুরাণ হইতে কুমারসম্ভবের গল্পভাগ গৃহীত হয় নাই। প্রাচীন পুরাণ বা গল্প হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে।

কুমারসম্ভবে কুমার অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। তারক নামক অসুর বিরিঞ্চি-দত্ত বরপ্রভাবে ত্রিলোকের উপপ্লবের জন্ম ধূমকেতুর ন্যায় উত্থিত হইয়াছিল। সে এতদূর পরাক্রান্ত ও গর্ব্বিত হইয়াছিল যে দেবরাজ ইন্দ্রকে অমরাবতী চ্যুত করিয়া স্বর্গ রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিল। দেবতারা যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি বিষ্ণুর চক্রও তাহার কোন অনিষ্টসাধনে সক্ষম হয় নাই। সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবান ঔষধ সকল যেমন ব্যর্থ হয়, তদ্রূপ অসুরবধের জন্ম দেবতাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, বাসুকী সকলেই অসুররাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইন্দ্রও তাহার সন্তোষসাধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন যে, নগনন্দিনী উমার গর্ভে মহাদেবের যে সন্তান হইবেন তিনি ভিন্ন কেহই অসুর নিপাতে সক্ষম হইবেন না। তখন দেবতারা উদ্যোগী হইয়া হরগৌরীর শুভ পরিণয় সম্পাদন করিতে ব্রতী হইলেন। প্রথমে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পরে পার্ব্বতীর উগ্র তপে তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে দেহার্দ্ধভাগিনী করিলেন। পরে কুমারের জন্ম হইল। দেবসেনার

সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া তিনি তারকাসুরকে বধ করিলেন। ইহাই কুমারসম্ভবের স্থূল বৃত্তান্ত।

এই মহাকাব্যে সত্যের জয় বর্ণনা করাই কবির উদ্দেশ্য। বলপূর্ব্বক একজনকে অধিকারচ্যুত করিলে অতি প্রবল ব্যক্তিরও পতন যে অবশ্যম্ভাবী এক দিকে যেমন তাহা দেখান হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই স্বার্থসিদ্ধির জন্য যোগে যতাত্মা মহাযোগীর ধ্যানভঙ্গ করিলে কিরূপ শাস্তিভোগ করিতে হয় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ইষ্টলাভ করিতে একাগ্রচিত্ত না হইলে যে ফললাভের সম্ভাবনা থাকে না তাহাও দেখান কবির উদ্দেশ্য। উমার পঞ্চতপ-দ্বারা সিদ্ধিলাভ দেখাইয়া কবি তাহাই বুঝাইয়াছেন।

এই কাব্যের নায়িকা গৌরী ও নায়ক মহাদেব। উমা আদ্যা-শক্তি। কিন্তু উপনিষদে বর্ণিতা দেবগণের দর্পচূর্ণকারিনী ব্রহ্মশক্তি-রূপে এস্থলে দেখা দিতেছেন না—পুরাণোক্তা বিশ্বজননীরূপে সমুপস্থিতা হইয়াছেন। যোগ দ্বারা বিসৃষ্টদেহা ভবপূর্ব্বপত্নী সতী শৈলবধূ মেনকার গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার রূপে হিমালয়ের গৃহ আলোকিত হইয়াছে। পুত্র সত্বেও গিরিরাজ কন্যাটীর প্রতি অধিক স্নেহ ও বাৎসল্য দেখাইতেছেন। গৌরী কেবলমাত্র রূপে অতুলনীয়া নহেন, পূর্ব্বজন্মের ফলে সকল বিদ্যাতেও অধিকারিণী হইয়াছেন। তিনি যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিলে দেবর্ষি নারদ একদিন স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের গৃহে উপনীত হইলেন, এবং উমার রূপ দেখিয়া তিনি বলিলেন, উমা হরের দেহার্দ্ধভাগিনী হইবেন। হিমালয় দেবর্ষির কথা শুনিয়া অন্য বর চেষ্টা করিলেন না। এই সময় সতী-শোকে মহাদেব বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। নিতি গঙ্গাপ্রবাহে তপস্যায়

নিযুক্ত ছিলেন। হিমালয় কন্যাকে শঙ্করের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু একাকিনী না পাঠাইয়া দুই জন সখী সঙ্গে দিলেন। গৌরী মহাদেবের পূজার কারণ সমিৎ পুষ্প আহরণ, যজ্ঞবেদী পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্য করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীজাতি তপস্যার অন্তরায় হইলেও শঙ্কর গৌরীর শুশ্রূষায় আপত্তি করিলেন না। কেন না যিনি ধীর, তাঁহার চিত্তবিকৃতি হইতে পারে না।

এ দিকে দেবগণ অসুররাজ তারকের অত্যাচারে নিতান্ত উদ্বেলিত হইয়াছেন। মহাদেবের যোগভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সংসারী করিতে না পারিলে, তাহাদের শত্রুনিপাত হয় না। এই জন্য দেবরাজ মদনকে মহাদেবের যোগভঙ্গ করিতে পাঠাইলেন। মদন, রতি ও বসন্তকে সহায় করিয়া মহাদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইল এবং মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিবার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মহাদেবকে দেখিয়া ভয়ে তাহার হস্তস্থিত পুষ্পধনু খসিয়া পড়িয়াছিল। এমন সময়ে নগরাজনন্দিনী গৌরী সখী সঙ্গে মহাদেবের পূজার জন্য আগমন করিলেন। সেদিন গৌরী রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া, বসন্তপুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মদনের মনে আশার সঞ্চার হইল। মহাদেবও সেই সময় ধ্যান হইতে বিরত হইলেন। নন্দী, নগনন্দিনী পরিচর্য্যা জন্য উপস্থিত হইয়াছেন এই সংবাদ দেবাদিদেবকে জানাইলে তিনি গৌরীকে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন। পার্ব্বতী মহাদেবের চরণতলে পুষ্পরাজি অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলে, মহাদেব আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তুমি অনন্যাসক্ত পতি লাভ কর।" পার্ব্বতী মন্দাকিনী হইতে পদ্মবীজ তুলিয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক করতঃ যে জপ-

মাল্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা মহাদেবের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। যেমন মহেশ্বর গৌরীর হস্ত হইতে সেই মালা গ্রহণ করিবেন, মদন অমনই অবসর বুঝিয়া সম্মোহন নামে পুষ্পবাণ মহাদেবের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। মহাদেবের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। তিনি গৌরীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গৌরীর দেহ রোমাঞ্চিত হইল। স্বভাবসিদ্ধধৈর্য্যগুণে মহাদেব তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া চিত্তবিকারের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মদনকে দেখিয়াই ক্রোধে তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইল। সেই অগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইল।

সখী সমক্ষে এইরূপ বিফল মনোরথ হইয়া উমা অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন। অভিমানিনী গৌরী তখন তপস্যাদ্বারা দেবাদিদেবকে সন্তুষ্ট করিবার অভিলাষ করিলেন। মেনকার সহস্র বাধা, সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তপস্যা করিতে গমন করিলেন। তিনি যে মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়াছেন, তাহাতে মাতার স্নেহবাক্য তাঁহাকে ফিরাইবে কিরূপে? অভীপ্সিত বস্তুতে যাহার একমাত্র লক্ষ্য, কে তাহাকে বাধা দিতে পারে? গৌরী তখন পঞ্চতপঃ করিতে লাগিলেন। যিনি পূর্ব্বে কন্দুক-ক্রীড়াতেও ক্লেশ বোধ করিতেন, তিনি গ্রীষ্মকালে চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া নিজে তাহার মধ্যে অবস্থিতি করতঃ সূর্য্যের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। বর্ষাকালে রাত্রিতে অনাবৃত স্থানে শিলাতলে শয়ন করিয়া তিনি অজস্র বারিধারা ও ঝঞ্ঝাবায়ু সহ্য করিতেন। পৌষমাসের রাত্রিতে জলমধ্যে অবস্থান করিতেন। গলিত বৃক্ষপত্র ভোজন করিয়া প্রাণধারণ তপস্যার পরাকাষ্ঠা হইলেও পার্ব্বতী তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৌরীর এরূপ

কঠোর তপস্যায় মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আগমন করিলেন। কিন্তু অগ্রে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উমার মন পরীক্ষা করিবার জন্য শিব নিন্দা করিতে লাগিলেন। উমা তখন তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন। "হা নীলকণ্ঠ" ভিন্ন অন্য কথা নাই। তখন কি আর কেহ শিব নিন্দা করিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে পারে? এ স্থলে একটী শ্লোক দ্বারাই উমাচরিত্রের পূর্ণবিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিবার্য্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ
পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্॥

অর্থাৎ—মহতের নিন্দা যে করে সেই কেবল পাপী নহে, যে শুনে সেও পাপভাগী হয়, অতএব সখি! এই ব্রাহ্মণবটুকে নিবারণ কর। এই বলিয়া গৌরী সে স্থান ত্যাগে উদ্যতা হইলে মহাদেব আত্মপ্রকাশ করিলেন, এবং অভীপ্সিত বরদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ গৌরী মহাদেবকে প্রতিশ্রুত করাইলেন, হিমালয়ের নিকট হইতে তিনি তাঁহাকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিবেন।

উমা চরিত্রে কবি ভক্তি ও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু বিবাহান্তে উমাকে সামান্যা নায়িকার ন্যায় নববধূভাবে উপস্থিত করিয়া কবি ভাল করেন নাই। নবযৌবন সম্পন্না উমা কি "ভাববোধ কলুষা" দয়িতা হইতে পারেন?

মহাদেব দিব্য নায়ক। প্রথমতঃ আমরা তাঁহাকে যোগমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাই। জগৎপতির আবার যোগ কি জন্য, তাহা কে জানে? বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও

লয় কর্ত্তা দেবাদিদেব যে সর্ব্বদাই যোগে মগ্ন থাকিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। তাঁহার নিজের জন্য চিন্তা করিবার সময় কোথায়? সর্ব্বদাই তিনি জগতের হিতে নিরত। তিনি ধীর সে জন্য গৌরীর শুশ্রূষায় আপত্তি করেন নাই। কিন্তু যখনই তাঁহার তপস্যার অন্তরায় উপস্থিত হইল,—অকালে রতিপতি যেমন তাঁহার যোগভঙ্গ করিতে উদ্যত হইল, অমনই তাঁহার ক্রোধের উদয় হইল। এই ক্রোধ অতি পবিত্র। ঐশীশক্তির নিকট অন্য শক্তি কার্য্যকারী হইতে পারে না, হইলেই ক্ষণমাত্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়! অগ্নিতে পতঙ্গ পড়িলে দগ্ধ হইবে—ইহাই নিয়ম। সুতরাং সে ক্রোধের বিরামের জন্য শতবার অনুনয়, সাধ্যসাধনা করিলে তাহা বিরত হইবে না। এখানেও তাহাই হইল। মদন ভস্ম হইল। আবার যখন শঙ্কর ইচ্ছা করিলেন তখন তাহার পুনঃসৃষ্টি হইল।

মহাদেব নিজে তপস্যামগ্ন হইলেও ভক্তগণের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। গৌরী যখন পঞ্চতপে নিমগন, যখন তাঁহার কঠোর তপে সকলেই তাপিত হইয়াছে, তখন ভগবানও আকৃষ্ট হইলেন—আপনা হইতে আসিয়া দেখা দিলেন। তথাপি একেবারে প্রার্থনা পূরণ না করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উমার মন বুঝিতে গেলেন। কিন্তু জগদীশ্বরও জগন্মাতার নিকট পরাভূত হইলেন। উমার মন তখন শঙ্করের প্রতি অর্পিত হইয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছে—"যখন হা নীলকণ্ঠ, হা নীলকণ্ঠ" শব্দ ভিন্ন গৌরীর মুখে অন্য শব্দ নাই—তখন তিনি নিজ নিন্দা করিয়া কি উমার মন ফিরাইতে পারেন? চেষ্টা ফলবতী হইল না। উমা বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপী শিবের কথায় বিরক্ত হইয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে উদ্যতা হইলেন এবং

" মহতের নিন্দা শুনিলেও পাপ আছে" বলিলেন তখন কাজেই মহাদেব আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজ পরিচয় দিতে বাধ্য হইলেন এবং পরিণয় অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু নিজে ত আর হিমালয়ের নিকট যাইয়া বিবাহ প্রার্থনা জানাইতে পারেন না। সেজন্য জগতের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক সপ্তর্ষিদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ঘটক নিযুক্ত করিলেন! এই চিত্রে একদিকে যেমন বিবাহেচ্ছুর আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনই প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ ব্যক্তির প্রতিজ্ঞাপালনের ব্যগ্রতা দেখা যাইতেছে। সপ্তর্ষিগণের নিকট প্রার্থনাসিদ্ধির যাবতীয় অনুকূল যুক্তির অবতারণা করিয়া আর্য্যা অরুন্ধতীকেও সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। কেননা বিবাহাদি ব্যাপারে স্ত্রীগণের পটুত্ব অধিক পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে সপ্তর্ষি ও অরুন্ধতীকে গমনে উৎসাহিত করিয়া মহাকোশী প্রপাতে তাঁহাদের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎকারের স্থান নির্ণয় করিলেন। তাঁহার আর কালবিলম্ব সহ্য হইতেছে না কতক্ষণে প্রতিজ্ঞা মুক্ত হইবেন ইহাই চিন্তা হইয়াছে—এই জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ দেখা যাইতেছে। যাহাহউক সপ্তর্ষিগণ ও অরুন্ধতী সিদ্ধকাম হইলেন। হিমালয় কন্যাদানে সম্মত হইলেন। অচিরে হরগৌরীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। হর গৌরীর সহিত একাত্মভাবে বিহার করিতে লাগিলেন। অতঃপর কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইল। তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া দেবগণ তারকাসুরের বধ সাধন করিলেন।

এই স্থানে কামদেব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। মদন তরল-মতি উদ্ধত ও চপল। কাণ্ডাকাণ্ড বুঝিবার তাদৃশ ক্ষমতা তাহার আছে বলিয়া বোধ হয় না। যেমন দেবরাজ

ইন্দ্র স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য তাহাকে একটু বাড়াইলেন, সে অমনি গলিয়া গেল। বুঝিল না যে প্রভুরা কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য অধীনস্থদিগকে কখনও কখনও সম্মান প্রদর্শন করেন। কার্য্য ফুরাইলে সে সম্বন্ধ থাকে না। মদন বিবেচনা করিল তাহার সমান আর কেহ নাই, কেননা দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে সিংহাসনের সমীপে আদর করিয়া বসিতে বলিয়াছেন! মদন তখন অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া আত্ম-গরিমার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে বুঝিল না যে, যে ভার তাহার উপর ন্যস্ত হইবে তাহার গুরুত্ব কত। আত্ম-গরিমায় সে তখন এতই স্পর্দ্ধিত হইয়াছে—অহঙ্কারে এতই স্ফীত হইয়াছে যে পিনাকপানি হরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে সে প্রস্তুত। অন্যলোকের ধর্ম্মপীড়া করা ত সামান্য কথা। এতদিন সে ফুল লইয়া খেলা করিয়াছে, যুবতীগণের শরীরে ও মনে সন্তাপ দিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, প্রবাসীগণের মনে তুষানল জ্বালিয়া দিয়া মজা দেখিয়াছে, তাই সে মনে করিয়াছে তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই, যাবতীয় কার্য্যই তাহার সাধ্যায়ত্ত। তাহার যেমন শিক্ষা সে তেমনই বুঝিয়াছে। নহিলে দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইবে কেন? দেবরাজের আজ্ঞায় বসন্ত ও রতিকে সহায় করিয়া সে মহাদেবের আশ্রমে স্বকার্য্য সাধন আশয়ে উপস্থিত হইল। নন্দী তাহার অসাধু ইচ্ছা জানিতে পারিয়া নিষেধ করিল। কিন্তু যখন ভবিতব্য তাহাকে টানিয়াছে তখন সে নিবৃত্ত হইবে কেন? যোগমগ্ন "নিবাত নিকম্প প্রদীপের" ন্যায় অবস্থিত মহাদেবকে দেখিয়া তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইলেও দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য সে মহাদেবের প্রতি বাণক্ষেপের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। যখন

দেখিল গৌরী অতি যত্নে মন্দাকিনী হইতে পদ্মবীজ সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রাতপে শুষ্ক করিয়া শঙ্করের জন্য জপমালা রচনা করিয়াছেন এবং প্রসন্নচিত্তে শঙ্কর গৌরীর হস্ত হইতে সে মালা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন সে সম্মোহন বাণক্ষেপের উপযুক্ত অবসর মনে করিল। মহাদেবের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। তিনি সম্মুখে মদনকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার ললাট হইতে অগ্নি নির্গত হইল। দেবগণ মহাদেবকে তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে না করিতেই অগ্নি তাহাকে ভস্মসাৎ করিল।

এইখানে দুইটী শক্তির পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত দেখা যাইতেছে। সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় হইল তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে। এখানে মদনকে রক্তমাংস বিশিষ্ট শরীরী আকারে যেমন দেখিতেছি, মনোভব ভাবেও সেইরূপ দেখিতে পাইতেছি। এখানে কাম ক্ষণেক চিত্তবিকার মাত্র এবং পবিত্রচেতা সংযতাত্মার নিকট তাহার অবশ্যম্ভাবী পরাজয় ও ধ্বংস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কবি প্রথমে কথায় "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এবধীরা" বলিয়াছেন, পরে কার্য্যতঃ তাহাই দেখাইলেন।

কুমারসম্ভবের প্রথম সাতসর্গ সর্ব্বত্র অনুশীলিত হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিলাম। অবশিষ্ট দশম সর্গের অনুশীলন নাই বলিলেও চলে। বঙ্গদেশে কুমারের যে শেষ দশসর্গ দেখা যায় তাহা কালিদাসের লেখনী নিসৃত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন কারণ মল্লিনাথও এই অংশের টীকা প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহাদের মতে কোন আধুনিক কবি উক্ত দশ সর্গ রচনা করিয়াছেন। যাহা হউক কালিদাস

গৌরীকে সামান্য নায়িকার ন্যায় চিত্রিত করিয়া উত্তরভাগে হর-গৌরীর বিহার বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়াই শেষ দশসর্গের অনুশীলন অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কেন না হিন্দুমাত্রেই যাঁহাদিগকে জগতের পিতামাতা জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে সামান্য নায়ক নায়িকার ন্যায় চিত্রিত হইতে দেখিলে তাঁহারা সে গ্রন্থ অপাঠ্য মনে করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। আলংকারিকেরাও হরগৌরীর বিহার বর্ণনা অত্যন্ত অনুচিত ও দুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এরূপ প্রবাদ আছে যে এক কুম্ভকারের সহিত কালিদাসের অত্যন্ত মিত্রতা ছিল। কুমারসম্ভব রচনা করিয়া কালিদাস অগ্রে সেই মিত্রকে দেখাইতে লইয়া যান। কুম্ভকার পাঠান্তে কাব্যখানি সম্মুখস্থিত এক খানি কাঁচা সরার উপর রাখিয়া দিলে কালিদাস মনে করিলেন কাব্য খানি নিতান্ত কাঁচা হইয়াছে। এজন্য তিনি গ্রন্থখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কুম্ভকার অতি কষ্টে প্রথম সাত সর্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন। অবশিষ্ট দশ সর্গ এই প্রকারে বিলুপ্ত হইল। বলা বাহুল্য এ কিম্বদন্তী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

অতঃপর অতি সংক্ষেপে আমরা প্রথম সর্গের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম সর্গে উমার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে হিমালয়ের শোভা সমৃদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে। দেবতাত্মা নগাধিরাজ প্রথমে শৈলভাবে আমাদিগকে দেখা দিতেছেন। তিনি অনন্তরত্নের আকর এজন্য হিমাধিক্য তাঁহার সৌভাগ্য বিলোপের কারণ হয় নাই। চমরী-গাভীগণ গিরিরাজের সেবা করিতেছে, রাত্রিতে ওষধি সমূহ জ্যোতি প্রদান করিতেছে, সিদ্ধগণ পুণ্যভূমি

হিমালয়ে তপশ্চরণ করিতেছেন। এই বর্ণনা মনোহারিণী হইলেও মনে ভক্তি ও ভয় মিশ্রিত ভাব আনিয়া দেয় না। প্রাচীন কবিগণ প্রকৃতির শোভা বর্ণন করিতে যেরূপ ভ.ল বাসিতেন গম্ভীর বর্ণনা তাঁহাদের সেরূপ রুচিকর ছিলনা। এজন্য তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নৈপুন্য দেখাইছেন, প্রগাঢ় অথবা গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক বর্ণনায়, উদ্ধত ও ওজস্বী বর্ণনাতে তাদৃশ পটুতা দেখাইতে পারেন নাই। উপবন, বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনায় তাঁহারা যেরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন পর্ব্বত বা সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনায় তাদৃশ ক্ষমতা দেখান নাই। আদি, করুণ ও শান্ত রসাশ্রিত বর্ণনায় তাঁহারা যে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ছিলেন তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহাদের হাস্য, বীর ভয়ানক প্রভৃতি রসাশ্রিত বর্ণনা তাদৃশ মনোহারিণী নহে।

শৈলরাজকে অতঃপর আমরা শরীরী সংসারীর অবস্থায় দেখিতে পাই। হিমালয়ের পরিচয় অধিক প্রদত্ত হয় নাই। যেটুকু দেখিতে পাই, তাহাতে তিনি আপ্তবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ দেবদ্বিজ-অতিথি সেবক ও নিতান্ত নিরীহ ধর্ম্মরত ব্যক্তির ন্যায় দেখা দিতেছেন।

নারদ আগমন এই সর্গের এক প্রধান ঘটনা। ইহাই লতাকারোপণ। দেবর্ষির কথায় নির্ভর করিয়াই হিমালয় যোগমগ্ন মহাদেবের সেবায় পার্ব্বতীকে নিযুক্ত করিলেন। মহাদেব তপস্যায় রত হইয়া বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন—ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে সত্বর হরগৌরীর মিলনের সম্ভাবনা নাই।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে ইহ জন্মের শুভাশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকে কালিদাস তাহা

বিশ্বাস করিতেন। গৌরীর অশেষ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ যে পূর্ব্বজন্মফলে ঘটিয়াছিল তাহা তিনি বলিয়াছেন। রঘুবংশেও কবি এ কথা বলিতে ভুলেন নাই।

দ্বিতীয় সর্গ। এই স্বর্গে তারকাসুরের পরাক্রমে দেবগণের দুরবস্থা, ইন্দ্রের অধিকার লোপ প্রভৃতি স্বর্গরাজ্যের দুর্দ্দশা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবগণ ব্রহ্মার নিকট আপনাদের দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহার কাছে শত্রু-বিনাশের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন হরগৌরীর পরিণয় হইলে যে কুমার জন্মিবেন, তিনিই দেবশত্রু নিপাতে কৃতকার্য্য হইবেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা গেল মহাদেবকে সংসার আশ্রম অবলম্বন করাইতে দেবগণ প্রয়াসী হইবেন। এই স্বর্গে কবি নিজ ধর্ম্ম-মতের পরিচয় দিয়াছেন। বিধি, বিষ্ণু, শিব যে একই ঈশ্বরের গুণ বিশেষের কল্পনামাত্র কবি তাহাই বুঝাইয়াছেন। কবির উদারনীতির পরিচয়ও এ সর্গে পাওয়া যায়। বিষবৃক্ষ রোপণ করিলেও স্বয়ং তাহা ছেদন করা উচিত নহে, এ কথা কতদূর মহত্বের পরিচায়ক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তৃতীয় সর্গ। দেবগণের কার্য্যসাধনের জন্য মদনের গমন ও মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা তৎপরে মদন-ভস্ম বর্ণিত হইয়াছে। মদনের প্রগল্‌ভতার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই স্বর্গে অকাল বসন্ত বর্ণন বড়ই মনোহর। কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির পূর্ণ পরিচয় এইস্থানে পাওয়া যায়। তৎপরে সখীসমক্ষে উমার—মহাদেবের নিকট প্রত্যাখ্যান চিত্র দেখাইয়া কবি উমার ভাবী কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আভাস দিয়া রাখিলেন।

চতুর্থ সর্গ। মদন বিনাশে রতির আক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে।

নিতান্ত প্রাসঙ্গিক না হইলেও রতিবিলাপ পড়িয়া কাহার হৃদয় না আর্দ্র হয়। রতি সতী স্ত্রীর ন্যায় স্বামীর চিতাভস্ম লইয়া সহগমনে উদ্যতা। স্বামীসহচর বসন্তকে দেখিয়া তাহার শোক-বহ্নি প্রবলতর হইল, এ বর্ণনাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। দৈববাণী শ্রবণে সহগমন সংকল্প ত্যাগ করিয়া জীবন্মৃতার ন্যায় রতির অবস্থান পড়িয়া মনে হয় কালিদাসের সময় সতীদাহ প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। যাহারা অনুমৃতা হইতে পারিত না তাহারা কিরূপ দুঃসহ যাতনা ভোগ করিত তাহা দেখান কবির উদ্দেশ্য।

পঞ্চম সর্গ। গৌরীর উগ্রতপঃ বর্ণিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কবি দেখাইয়াছেন অভিলষিত বস্তু লাভে একাগ্রচিত্ত হইলে অবশ্যই তাহা লাভ হয়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" ইহা দেখান কবির উদ্দেশ্য। উমা চরিত্রে এ বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গ। হরগৌরীর বিবাহের বাগ্দান উপলক্ষে নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এ সর্গের ওষধিপ্রস্থবর্ণন অতি হৃদয়গ্রাহী। সপ্তর্ষিগণের ঘটকালীতে হিমালয় মহাদেবকে কন্যাদানে স্বীকার করিলেন। এই ঘটকালী দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, কালিদাস যেন আজীবন ঘটকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। পূর্ব্বকালের বিবাহপ্রথায় কতকটা আভাসও ইহা হইতে পাওয়া যায়। কালিদাসের সময় বোধ হয় কন্যাপ্রাপ্তি তত সুলভ ছিল না। বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে তোষামোদ করিতেন! যাহা হউক কন্যার গর্ভধারিণীর অমতে কোন কার্য্য হইত না। এখনও হয় না। বিবাহের পূর্ব্বে তখনও "লগ্নপত্র" হওয়ার নিয়ম ছিল।

৭ম সর্গ। এই সর্গে হরপার্ব্বতীর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে এবং কামদেবের পুনরায় জীবনপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে অধিবাস ও গাত্র হরিদ্রাদি হইত। এখনকার মত কুশণ্ডিকা, ধ্রুবতারা দর্শন লাজাঞ্জলি দান ও বাসরঘর প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল*। তখনও বিবাহান্তে বরবধূ সভাস্থ গুরুজনকে প্রণাম করিতেন। তখনও পুরস্ত্রীগণ ব্যস্ত হইয়া বর দেখিবার জন্য গবাক্ষদ্বারে উপস্থিত হইতেন। তবে বিবাহ সভাতেই কুশণ্ডিকা কার্য্য সম্পন্ন হইত। বোধ হয়, পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহ সভায় এখনও যেরূপ নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে পূর্ব্বেও সেইরূপ হইত।

মেঘদূত।

মেঘদূত একখানি খণ্ডকাব্য। সংস্কৃত ভাষায় খণ্ডকাব্যের মধ্যে মেঘদূতই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ক্ষুদ্র কাব্যগুলি মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত অথচ সম্পূর্ণরূপে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নহে তাহাকে খণ্ড কাব্য বলে। খণ্ডকাব্যে আটের অধিক সর্গবিভাগ দেখা যায় না। সকলগুলিতে সর্গবিভাগ থাকেও না। খণ্ডকাব্যে একটী মাত্র রসের প্রাধান্য থাকে। অপরিচ্ছিন্নভাবে একটী মাত্র বিষয় বর্ণিত হয় এবং এক বৃত্ত বা ছন্দঃ ব্যবহৃত হয়। মেঘদূতে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। শৃঙ্গার রস দুই প্রকার—বিপ্রলব্ধ ও সম্ভোগ। এই কাব্যে বিপ্রলব্ধ নামক

* তখনও বিবাহের সময় "স্ত্রী আচার" ও "শুভদৃষ্টির" প্রথা ছিল।

শৃঙ্গার রসই প্রধান। ইহাতে মন্দাক্রান্তা নামে বৃত্ত বা ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মেঘদূত একখানি অতি ক্ষুদ্র কাব্য। ইহার শ্লোক সংখ্যা ১২৭ মাত্র। প্রক্ষিপ্তাংশ বাদ দিলে ১১০টী মাত্র শ্লোক থাকে। কাব্যখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার রচনা এমন চমৎকারিণী ও মনোহারিণী যে কালিদাস যদি অন্য কোন কাব্য রচনা করিয়া না যাইতেন, তথাপি একমাত্র মেঘদূতই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত। এই কাব্যে কবি এরূপ সূক্ষ্মক্ষমতা ও বর্ণনাচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন যে এই একমাত্র কাব্য দ্বারা তিনি কবিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভে সমর্থ হইয়াছেন। কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের রচনা যেরূপ প্রাঞ্জল, মেঘদূতের রচনা সেরূপ নহে। ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত গাঢ় ও দুরূহ। মেঘদূতে, অনাবশ্যকীয় স্থলেও আদিরসের অবতারণা আছে। এজন্য কাব্যখানি স্থানে স্থানে এরূপ অশ্লীল হইয়া উঠিয়াছে যে গুরুর নিকট অধ্যয়ন করা শিষ্যের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে। অনুমান হয় কালিদাস প্রথম বয়সে এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে ভারতীর বরপ্রসাদে অদ্বিতীয়-কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া গৃহপ্রত্যাগত কালিদাস সহধর্ম্মিণীকে দ্বার খুলিতে বলেন। বিদুষী ভার্য্যা তখনও অভিমানবতী ছিলেন। এজন্য দ্বার খুলিবার পূর্ব্বে তাঁহার আগমন কারণ জানিতে চাহিলেন। তখন কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন—"অস্তি কশ্চিৎ বাগ্বিশেষঃ"। কালিদাসের মুখে সুমধুর সংস্কৃত শুনিয়া সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে ঐ বাক্যের এক একটী পদ লইয়া এক একখানি কাব্য রচনা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। কালিদাসও তদনুসারে "অস্তি" হইতে

কুমারসম্ভব, "কশ্চিৎ" হইতে মেঘদূত ও "বাক্" হইতে রঘুবংশ রচনা করিয়াছে এ প্রবাদের মূলে যাহাই থাকুক, মেঘদূত যে কালিদাসের সর্ব্ব প্রথম রচনা, ইহার রচনা-প্রণালীই তাহার প্রমাণ।

মেঘদূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কয়েকটী মত প্রচলিত আছে। নব্যপণ্ডিতগণের মতে মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরের শাসন-কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া কাশী-বাসকালে স্ত্রীবিরহে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতৃগুপ্ত যে কালিদাস নহেন তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অপর মত এই যে ঘটকর্পরের যমক কাব্য হইতে কালিদাস মেঘদূতের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। যমক কাব্যে মেঘকে দৌত্যভার দেওয়া হইয়াছে। তাহাই অব-লম্বন করিয়া কালিদাস তদপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট মেঘদূত রচনা করিয়া ঘটকর্পরকে অপ্রতিভ করিয়াছিলেন। এ মতটী শুনিতে ভাল লাগে। নলোদয় সম্বন্ধেও এরূপ প্রবাদ আছে। কিন্তু যমক কাব্য প্রাচীন গ্রন্থ কি না তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। টীকাকার মল্লিনাথ এ প্রবাদের উল্লেখ করেন নাই।

মল্লিনাথ বলেন রামায়ণ বর্ণিত রাম কর্ত্তৃক সীতা সমীপে হনুমানকে দিয়া সংবাদ-প্রেরণ অবলম্বন করিয়া কালিদাস মেঘকে দৌত্যভার দিয়াছেন। অধিক মনোহারী করিবার জন্যই সচেতন স্থানে অচেতন পদার্থকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ মতটী নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। উত্তর মেঘের একটী শ্লোক দেখিয়া এ মতে আস্থা স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয়। যক্ষ মেঘকে বলিতেছে—"পবনতনয় হনুমানকে দেখিয়া মৈথিলী যেমন অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন মৎপ্রিয়াও তোমায় সেইরূপ আদর করিয়া তোমার

কথাগুলি শুনিবেন।" ইহা হইতে মেঘদূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী সূক্ষ্ম সূত্র পাওয়া যাইতেছে। যাহাহউক দৃঢ়তার সহিত ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে না পারিলেও, মেঘদূত হইতে যে অনেক "দূতের" উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায়। হংসদূত, পদাঙ্কদূত, শুকসংবাদ প্রভৃতি মেঘদূতের অনুকরণে লিখিত। পদাঙ্কদূতে মেঘদূতের ছন্দপর্য্যন্ত অনুকৃত হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু যতই অনুকরণ হউক না কেন, আদর্শকে কোনটী অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং অনুকরণ দ্বারা মেঘদূতের আদর ও গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিতে হইবে।

মেঘদূতের স্থূল বৃত্তান্ত এইরূপ – ধনপতি কুবের সর্ব্বদা শিবের আরাধনা করিয়া থাকেন। দেবাদিদেবের পূজার জন্য তিনি পদ্মবন করিয়া রাখিয়াছিলেন। মত্ত হস্তীগণ কমল বন নষ্ট করে বলিয়া তিনি তাহার রক্ষার জন্য জনৈক যক্ষকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত যক্ষ অত্যন্ত স্ত্রৈণ। স্ত্রৈণতাবশতঃ সে প্রভুর আজ্ঞা পালনে অবহেলা করিয়াছিল। কাজেই যক্ষরাজ তাহাকে এক বৎসরের জন্য অলকা হইতে নির্ব্বাসিত করেন। যক্ষ ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইয়া রামগিরিতে অবস্থান করিতে লাগিল। কোনপ্রকারে নির্ব্বাসনের আট মাস কাটাইয়া আষাঢ় মাসে নবমেঘের উদয় দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। প্রিয়ার নিকট সংবাদ প্রেরণের জন্য ব্যাকুল হইয়া মেঘকে দৌত্যভার লইতে প্রার্থনা করিল। এবং রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত মেঘের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে যক্ষপুরী অলকা ও নিজ ভবনের বর্ণনা করিয়া নিজ স্ত্রীর বিরহাবস্থা অতি মাত্র সহৃদয়তার সহিত বর্ণনা করিল।

মেঘের পথ নির্দ্দেশ উপলক্ষে কবি, নানা গিরি, নদী, উপবন ও জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দশার্ন দেশের রাজধানী বিদিশা ও উজ্জয়িনীর বর্ণনা উল্লেখ যোগ্য। রামগিরি হইতে উত্তরে যাইবার পথ বক্র হইলেও কবি মেঘকে উজ্জয়িনী দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। উজ্জয়িনীর প্রতি কালিদাস যে পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে সহজেই মনে হয় উক্ত নগরী কবির প্রিয় বাসভূমি ছিল। জন্মভূমিকে সকলেই স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করেন। কালিদাস ও বলিতেছেন—"সৌভাগ্য-সম্পত্তি-শালিনী উজ্জয়িনী দেখিলে মনে হয় যেন স্বর্গবাসিগণ পুণ্যফলের অল্পতা প্রযুক্ত মর্ত্তে আগমন করিবার সময় স্বর্গের এক খণ্ড সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন"। ইহা হইতে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় যে উজ্জয়িনী কবির প্রিয় বাসস্থান ছিল। উজ্জয়িনীর মহাকাল শিবের সান্ধ্য-আরতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় কালিদাস যেন এই আরতি দেখিবার জন্য প্রতিদিন তথায় উপস্থিত থাকিতেন। এখনও মহাকাল শিবের আরতি হইয়া থাকে। এখনও যাঁহারা তাহা দেখিতে যান তাঁহারা তাহা ভুলিতে পারেন না। পুরা-কালে ইহা যে কিরূপ মনোহর ব্যাপার ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

মেঘের পথ নির্দ্দেশ কালে উত্তর ভারতের তাদৃশ প্রসিদ্ধ কোন জনপদের উল্লেখ নাই। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে আর্য্য-বর্ত্তে অনেক সুন্দর নগর ছিল। কালিদাস ৬ষ্ঠ শতাব্দির লোক হইলে নিশ্চয়ই সে গুলির উল্লেখ করিতেন। কিন্তু চর্ম্মণ্বতী ও কুরুক্ষেত্র ভিন্ন উত্তর ভারতের অন্য কোন প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ দেখা যায় না। কুরুক্ষেত্রের পরে কনখল বা হরিদ্বারে গঙ্গা প্রবাহের উল্লেখ

আছে। তৎপরে হিমালয় বক্ষে গঙ্গোত্তরী, শিবপদ চিহ্ন ও ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্রের উল্লেখ দেখা যায়। তৎপরে কৈলাস পর্ব্বত ও তাহার উৎসঙ্গস্থিত অলকাপুরী বর্ণিত হইয়াছে।

অলকাপুরী যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী। গগন-স্পর্শি-সৌধ রাজি পুরীর শোভা সম্পাদন করিতেছে। প্রত্যেক গৃহে নানা প্রকার কারুকার্য্য ও চিত্রপট শোভা পাইতেছে। গৃহ-মধ্য হইতে সুমধুর গীত ও বাদ্য-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। প্রত্যেক গৃহে সৌন্দর্য্যের সারভূত স্থির-যৌবনা যক্ষবধূগণ বিরাজমানা। অলকায় ছয়টী ঋতু এক কালে বর্ত্তমান। যক্ষবধূগণের হস্তে শরৎকালীন পদ্মপুষ্প, কুন্তলে শিশিরজাত কুন্দকুসুম, চূড়াপাশে বসন্ত সময়ের নবকুরুবক, কর্ণে গ্রীষ্মসময়ের বিবিধকুসুম এবং সীমন্তে বর্ষাজাত কদম্ব শোভা পাইতেছে। লোধ্রপুষ্পের পরাগ দ্বারা তাঁহারা মুখশ্রীর পাণ্ডুতা সম্পাদন করিয়া অধিকতর কান্তিমতী দেখাই-তেছেন। যক্ষকন্যাগণ সুরনদী মন্দাকিনী তীরে সুশীতল বায়ু সেবন করিয়া মন্দার বৃক্ষের ছায়ায় আতপতাপ নিবারণ করেন। কখনও বা হস্তস্থিত মণি বালুকা মধ্যে লুকাইয়া তাহারই অন্বে-ষণ করতঃ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সুন্দরী বনিতা সঙ্গে যক্ষগণ স্ফটিক মণ্ডিত হর্ম্মতলে বসিয়া কল্পবৃক্ষ প্রসূত রতিফল নামক কামোদ্দীপক মদ্যপান করিয়া থাকে। কখনও বা অনু-রাগভরে প্রিয়তমার নীবীবন্ধ উন্মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলে লজ্জাবনতমুখী বধূগণ কুঙ্কুমমুষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা রত্নপ্রদীপগুলি নির্ব্বাণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকেন। নির্ম্মল চন্দ্রালোকে চন্দ্রকান্তমণি নিঃসৃত জলধারা বধূগণের সুরতজনিত অঙ্গগ্লানি অপনোদন করে। যক্ষকামিনীগণের সকল অভাব একমাত্র

কল্পবৃক্ষ হইতে পরিপূরিত হয়। বিচিত্রবসন, বিচিত্রভূষণ, অঙ্গ-শোভা সম্পাদক কুসুম কিশলয়াদি যাবতীয় সামগ্রী, এমন কি চরণ-শোভার লাক্ষারাগ ও নয়ন-শোভার মধু পর্য্যন্ত, কল্পবৃক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। অলকায় কামদেবের প্রভাব নাই। কেননা দেবাদিদেব মহাদেব তথায় সদাই বিরাজমান। যক্ষ-কামিনীগণের অপাঙ্গভঙ্গী কুসুমায়ুধের কাজ করিয়া থাকে। যক্ষগণের ধনরত্নের ক্ষয় নাই। সকলেরই ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং কোন অভাব কাহারও নাই। সকলেই প্রফুল্লমনে কল-কণ্ঠ কিন্নরগণের সহিত ধনপতির যশোগান করিয়া অপ্সরাগণের সহিত বৈভ্রাজ উপবনে বিহার করিয়া থাকে। অলকায় জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যুও নাই, এমন কি অভাব যে কি তাহা কেহ জানে না। সকলেই ভোগসুখে নিমগ্ন। কাহাকেও পরি-শ্রম করিতে হয় না। এক কথায় বলিতে হইলে অলকাপুরী নিত্যানন্দময়, নিত্য উৎসবময়।

অলকাপুরীর বর্ণনায় কালিদাস একটী আদর্শ জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা বা উদ্ভাবিনীশক্তির অসীম পরিচয় এই বর্ণনায় প্রদত্ত হইয়াছে। কোন দেশের কোন কবি এরূপ স্থান কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না সন্দেহ। কল্পনার চক্ষেও অলকাদর্শন, অলকাবাসীগণের প্রমোদবর্ণন, তাহাদের নিত্যকর্ম্মের বিবরণ প্রদান মনুষ্যক্ষমতার অতীত বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ যক্ষের নিজ ভবনের বর্ণনা যে কত সুন্দর, কত তৃপ্তিকর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কালিদাসের অসা-ধারণ কৃতিত্ব ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। সংসারের কঠোরতায় সন্তপ্ত হইয়া মানব-মন আদর্শস্থানের, আদর্শ সুখের অনুসন্ধান

করে। কালিদাসের অলকা সেই আদর্শস্থানের আদর্শস্থান, আদর্শসুখের আকর। একমাত্র মেঘদূতই কালিদাসের নাম অমর করিয়া রাখিতে সমর্থ।

কাশ্মীরবাসীগণ তাঁহাদের দেশকেই কবিকল্পিত অলকা মনে করিয়া থাকেন। এরূপ ভাবিবার কারণও থাকিতে পারে। কালিদাসের নির্দ্দেশ অনুসারে অলকাপুরী কৈলাস পর্ব্বতের কটিদেশে অবস্থিত। কিন্তু কবিকল্পিত অলকা যে পার্থিব নহে তাহাতে সন্দেহ নাই। মেঘদূতের নায়ক জনৈক যক্ষ। কুবেরের আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছিল বলিয়া সে অলকা হইতে রামগিরিতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। অলকার ন্যায় নিত্যানন্দময় পুরীতে অন্যরূপ শাসন সম্ভবে না। সেখানে পীড়ন-যন্ত্র বা কারাগার থাকিতে পারে না। মর্ত্তভূমেই হরিণবাড়ী থাকে। দেবযোনি সম্ভুত যক্ষ বা অপ্সরাদিগকে শাসন করিতে হইলে কিছুদিনের জন্য তাহাদিকে নির্ব্বাসিত করিলেই যথেষ্ট হয়। কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে আসিয়া মানবগণের জ্বালা যন্ত্রণা দেখিলে, দিব্যলোকবাসীগণের যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ ঘটিয়া থাকে। দিব্যলোকবাসীগণেরও প্রভুশক্তি বা বিশ্বশক্তির নিয়মলঙ্ঘন করিলে দণ্ড হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগ করায় যক্ষকে ভারতে আসিতে হইল। আবার যে স্থানে রামচন্দ্র ও সীতাদেবী বনবাস কালে অবস্থিতি করিয়াছিলেন সেইখানে তাঁহাকে থাকিতে হইল। রামচন্দ্র ও সীতার স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া তাঁহাকে অধিকতর ক্লেশ দিতে লাগিল। সর্ব্বদাই তাহার মনে তাহার স্ত্রীর কথা জানিয়া দিতে লাগিল। একে সে অত্যন্ত স্ত্রৈণ, তাহাতে রামগিরিতে অবস্থান সুতরাং তাহার বিরহ যন্ত্রণা

অসহ্য হইয়া উঠিল। যক্ষ যে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রভুর আদেশ পালনে বিরত ছিল এরূপ নহে। সে প্রিয়তমার পার্শ্বে বসিয়া প্রেমালাপ করিতে করিতে, প্রণয়িনীর বীণার তন্ত্রী বাঁধিয়া দিতে ব্যস্ত হওয়ায়, প্রিয়ার সহিত বাপীতটে উপবেশন পূর্ব্বক হংসগণের ক্রীড়া দেখিতে উৎসুক হওয়ায়, এবং পত্নীর বাম পদাঘাতে অশোক বৃক্ষের ও একগণ্ডুষ বদন মদিরা প্রক্ষেপ দ্বারা বকুলবৃক্ষের দোহদ ক্রিয়া দেখিবার জন্য ব্যগ্র হওয়ায়, প্রভুর আজ্ঞা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল। কুবের বা তাঁহার আদেশ তখন তাহার মনেই ছিল না। তাই বলিয়া সেত অব্যাহতি পাইতে পারে না। কঠোর শাসনের নিকট তাহার নিস্তার নাই। কাজেই এক-বৎসরের জন্য তাহাকে পত্নীবিচ্ছেদক্লেশ সহ্য করিতে হইল। একবৎসরের জন্য তাহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হইল। কোন প্রকারে আট মাস কাল কাটাইয়া আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নব-মেঘের উদয় দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। মেঘ দর্শনে পত্নীপার্শ্বে থাকিতে গৃহীর মনও চঞ্চল হয়। প্রবাসীরত কথাই নাই। যক্ষ ভাবিয়া ভাবিয়া নিজে কৃশ হইয়াছে। তাহার কেয়ূর করচ্যুত হইয়াছে তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রিয়তমা পত্নীর নিকট সংবাদ প্রেরণ, পত্নীকে আশ্বস্ত করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। সুতরাং তখন তাহার আর চেতনাচেতন বোধ নাই। সেইজন্য মেঘকে প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছে। মর্ত্তলোকবাসী হইলে হয়ত এরূপ করিত না। কিন্তু যক্ষ তখন পত্নীপ্রেমে উন্মত্ত কাজেই মেঘকে দৌত্যভার দেওয়ায় তাহাকে দোষী করা যায় না। বিশে-ষতঃ যখন ভারতবর্ষ হইতে অলকায় পত্র বা তাড়িতবার্ত্তা

পাঠাইবার সুবিধা নাই, পক্ষীটী পর্য্যন্ত সেখানে যাইতে পারে না, সেখানে মেঘ অথবা বায়ু ভিন্ন আর কে সন্দেশবহ হইতে পারে? মেঘ চাতকের আশা পূর্ণ করে, মানুষের আশা পূর্ণ করিয়া থাকে সুতরাং তাহাকে সংবাদবাহক করিতে বিরহী প্রেমোন্মত্ত যক্ষের চেষ্টা হইবে, তাহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় বা কি?

যক্ষ নিজে এতদিন প্রিয়ঙ্গুলতায় পত্নীর অঙ্গসাদৃশ্য, চকিত হরিণী নয়নে নয়ন সাদৃশ্য পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে বদন সাদৃশ্য ও ময়ূরের বর্হকলাপে কেশসাদৃশ্য দেখিয়া কোন গতিকে আট মাস গত করিয়াছে। কখনও বা গৈরিক ধাতুর দ্বারা শিলাতলে প্রিয়ার প্রণয় কুপিতা প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার চরণতলে নিপতিত নিজ প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়াছে। উত্তর দিক হইতে আগত বায়ু দ্বারা যদি প্রিয়ার অঙ্গস্পৃষ্ট হইয়া থাকে ইহা মনে করিয়া সেই বায়ু আলিঙ্গন করিয়া বিরহ যাতনা নিবারণ করিয়াছে। তথাপি পত্নীর বিরহাবস্থা স্মরণ করিয়া সে একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রণয়িনী যে অত্যন্ত বিরহবিধুরা হইয়াছেন ইহাই তাহার মনে হইতেছে। এবং পত্নীকে অগ্রে সংবাদ পাঠাইয়া আশ্বস্ত করা তাহার সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা হইয়াছে। যক্ষ নিজ স্ত্রীর যে বিরহাবস্থা কল্পনা করিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রেমের গভীরতা যে কিরূপ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

যক্ষ মনে করিতেছে শিশির আগমনে পদ্মিনী যেরূপ শ্রীহীনা হইয়া থাকে তাহার স্ত্রীও সেইরূপ কান্তবিরহে শ্রীহীনা হইয়াছেন। পতি কাছে না থাকিলে স্ত্রীগণের শোভাসম্পাদনের চেষ্টা থাকে না। যক্ষ বিরহে যক্ষপত্নীর বদনকমল করতলে ন্যস্ত হইয়াছে, অলকাবলী তৈল ও সংস্কারাভাবে মুখখানির উপর পড়িয়া তাহা

যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে, বিম্বের ন্যায় অধরোষ্ঠ উষ্ণনিশ্বাসে ম্লান ও ভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে। যক্ষপত্নী কখনও বা পতির প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছেন। কখনও বা পিঞ্জরস্থা সারিকাকে প্রভুর সোহাগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কখনও বা বীণার তন্ত্রী বাঁধিয়া প্রিয়তম-বিষয়ক গান গাহিবার চেষ্টা করিয়া মূর্চ্ছনা বিস্মৃত হইতেছেন এবং নয়নজলে বীণার তন্ত্রী আর্দ্র হইতেছে। কখনও বা দ্বারদেশে স্থাপিত পুষ্প লইয়া বিরহ সময়ের অবশিষ্ট দিন গণনা করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গে ভূষণ নাই, চক্ষে কজ্জল নাই—মধুপানে আসক্তি নাই। নিদ্রা হইতেও তিনি বঞ্চিতা হইয়াছেন।

যক্ষ আপন পত্নীর এইরূপ বিরহক্লিষ্ট মলিন বেশের কল্পনা করিয়াছে। যক্ষস্ত্রীর বিরহাবস্থার বর্ণনা অতীব মনোহারিণী। প্রত্যেক শ্লোকেই কালিদাসের মনুষ্যচরিত্র জ্ঞানের অসীম পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। যক্ষের অপেক্ষা যক্ষবধূর বিরহাবস্থাবর্ণন অধিক স্বাভাবিক। একটীমাত্র চিত্র দেখিয়া যক্ষবধূর চরিত্র বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। যাহার এরূপ প্রণয়িনী সে যে সমস্ত ভুলিয়া সেই প্রিয়ার পার্শ্বেই থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যক্ষ বুঝিয়াছে তাই মজিয়াছে। যক্ষ প্রেমরূপ যোগে মগ্ন। শত বাধা, শত বিঘ্ন, সহস্র শাসনেও এ যোগ ভঙ্গ হইবার নহে। সুতরাং ধনপতি কুবেরের শাসনে যক্ষের জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কোথায়? যক্ষকে শাসন করিয়া শুধরাইবার উপায় না দেখিয়া ধনপতি অবিলম্বে তাহার শাপবিমোচন করিলেন এবং অলকায় প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি দিলেন। যক্ষও পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া মহানন্দে দিনযাপন করিতে লাগিল। কালিদাসের মেঘদূতও শেষ

হইল। জ্যোতির্বিদাভরণের মতে মেঘদূত খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৩ অব্দের অনেক পূর্ব্বেরচিত হইয়াছিল।

রঘুবংশ।

কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য। এই কাব্যের রচনা যেরূপ বিষদ ও প্রাঞ্জল অন্য কোন কাব্যের রচনা সেরূপ নহে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, রঘুবংশ আদ্যোপান্ত সেই স্বভাব বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এই কাব্যের রচনা যেরূপ স্বভাবানুযায়িনী সেইরূপ মনোহারিণী। রঘুবংশ পাঠ করিবার সময় বুঝিতে পারা যায় কবির ভাব-সঙ্কলনের জন্য আদৌ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। একটী শ্লোক লিখিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকের জন্য তাঁহার আদৌ চিন্তা করিতে হয় নাই। ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অনর্গল বহির্গত হইয়াছে। তিনি আয়াস সহকারে কোন স্থান লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন এরূপ বিবেচনা হয় না। বস্তুতঃ কবিত্বশক্তি ও রচনাকৌশলের এরূপ একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতের কোন কবি কালিদাসের ন্যায় সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। শকুন্তলার অনুবাদক স্যার উইলিয়ম জোন্স কালিদাসকে সেক্ষপীয়রের সহিত সমান আসনে বসাইয়াছেন। কিন্তু যদি সেক্ষপীয়র মহাকাব্য রচনায় মন দিতেন তাহা হইলে তিনি সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হইতেন কি না সন্দেহ। কালিদাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া নিজ কবিত্বশক্তি ও

রচনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কালিদাসের প্রতিভা যেরূপ সর্ব্বব্যাপিনী ছিল অন্য কাহারও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

রঘুবংশ কালিদাসের প্রবীন বয়সের রচনা বলিয়া মনে হয়। কেন না ইহাতে আদিরসের ছড়াছড়ি নাই। অনাবশ্যক বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা নাই। বর্ণিত বিষয়েরও অতি বিস্তৃত সুতরাং বিরক্তিকর বর্ণনা নাই। কালিদাসের রচনার বিশেষত্ব এই যে তিনি কোন স্থানে অনাবশ্যক বা পরিবর্ত্তসহ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার উপমা অতুলনীয়া। তিনি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও লোকসিদ্ধ বিষয় হইতে উপমা আহরণ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সংক্ষেপে সেই উপমা সঙ্কলিত হইয়াছে যে পাঠমাত্রেই উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য বুঝিতে পারা যায়। রঘুবংশে কালিদাসের কবিত্বশক্তির পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্যের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। পড়িতে বসিলে বিরক্ত হওয়া দূরে থা'ক যত বার পড়া যায় ততবার অধিক হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ রঘুবংশকে উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে গণনা করেন না। তাঁহারা বলেন—"রঘুরপি কাব্যং তদপি পাঠ্যং"। রঘু আবার কাব্য, তাহাই আবার পড়িবার বিষয়! তাঁহাদের মতে মাঘপ্রণীত শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষ প্রণীত নৈষধ চরিত উৎকৃষ্ট কাব্য। রঘুবংশের সরল, মধুর ও ললিত রচনা ও স্বভাবানুযায়িনী বর্ণনা তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। তাঁহারা উৎকট অতিশয়োক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহুবিস্তৃত বর্ণনা এবং প্রগাঢ় ও গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক রচনা অধিক ভালবাসেন। যাহাহউক

কালিদাসকে সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহার উপমার চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব দেখিয়া সকলেই একবাক্যে কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। কালিদাসের রচনা যে সংস্কৃত রচনায় আদর্শস্বরূপ তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব কালিদাসকে কবিকুলগুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কালিদাসের পরবর্ত্তী কবিগণ সকলেই কালিদাস প্রণীত গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি ভাবসঙ্কলন করিয়াছেন।

এইরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইয়াও কালিদাস কিরূপ নিরহঙ্কার, অভিমান-শূন্য ও বিনয়ী ছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

যেমন বামন, উন্নত-পুরুষ-প্রাপ্য-ফল গ্রহণাভিলাষে হাত বাড়াইলে উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ অক্ষম আমি কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হওয়ায় উপহাসাস্পদ হইব।

কিন্তু এরূপ বিনয়ী ও অহঙ্কারশূন্য হইলেও দোষদর্শিসমালোচকগণের হস্তে কালিদাস নিস্তার পান নাই। সমালোচকগণ রঘুবংশের ন্যায় কাব্যেও দোষ দেখাইতে ক্ষান্ত হন নাই। এখনও অনেক পণ্ডিত রঘুবংশের প্রথম সর্গে "শশাপ সা" দেখিয়া বলিয়া থাকেন কালিদাস কেবল "শশা" "পশা" লিখিয়াছেন। এই সকল সমালোচকগণকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছিলেন—"সদসদ্বিবেচনাক্ষম ব্যক্তিগণ এই কাব্য শ্রবণ করুন, কেন না অগ্নিতেই কেবল স্বর্ণের বিশুদ্ধি বা কৃত্রিমতা সংলক্ষিত হয়।"

কালিদাসের ন্যায় মহাকবি ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারেন না।

কবি কেন রঘুবংশ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার একটু আভাসও দিয়াছেন। আজন্মশুদ্ধ, উদারচেতা, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয় রাজগণের গুণের পরিচয় শুনিয়া মহাকবি স্থির থাকিতে পারেন নাই। তাই কাব্যাকারে তাঁহাদের যশো-বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এরূপ মহানুভব মহাকবির চরিত্রে যাঁহারা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, যাঁহারা কালিদাসের চরিত্রশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে লম্পট নামে পরিচিত করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন তাঁহাদের স্বার্থান্ধতাই তাহার কারণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

রঘুবংশীয় রাজগণের নাম উল্লেখের সময় কালিদাস রামায়ণ বা পুরাণাদির যথাযথ অনুসরণ করেন নাই। রঘুবংশে উল্লিখিত রাজগণের নাম এবং পুরাণোল্লিখিত নাম প্রায়ই এক নহে। রঘুবংশে কালিদাস ২৯ জন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে চোদ্দটী নামের পুরাণোক্ত তালিকার সহিত ঐক্য হয় না। রঘুবংশে তিনটী নাম অধিক দেখা যায়। পুরাণে সে তিন নাম পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া বিবেচনা হয় কালিদাসের সময় পুরাণ ভিন্ন অন্য উপকরন বিদ্যমান ছিল। কালিদাস তাহা হইতে রঘুবংশীয় রাজগণের বংশতালিকা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। উল্লিখিত রাজগণ ভারতযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কালিদাস সর্ব্বপ্রথমে দিলীপ রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণে ইনি খট্টাঙ্গ দিলিপ নামে অভিহিত। পুরাণমতে তাঁহার পুত্র দীর্ঘবাহু। তৎপুত্র রঘু। কালিদাস এ স্থলে পুরাণ বা

রামায়ণ অনুসরণ করেন নাই। সগর প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় বহু প্রাচীন নৃপতিগণের উল্লেখ না করিয়া রামচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণের উল্লেখ করায় কালিদাসের রঘুবংশ অধিক প্রীতিকর হইয়াছে।

রঘুবংশের প্রথম তিন সর্গে কোশলেশ্বর সূর্য্যবংশীয় রাজা দিলিপের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। দিলিপ দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনই শারীরিকশক্তিসম্পন্ন এবং ক্ষত্রিয়োচিত যাবতীয় গুণে অলঙ্কৃত। তিনি কখনও মনুনির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইতেন না। অতি প্রিয় ব্যক্তিও দোষের কার্য্য করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতেন। প্রজার নিকট করগ্রহণ করিয়া তাহাদেরই হিতের জন্য তাহা ব্যয় করিতেন। তিনি এরূপ গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন যে তাঁহার আকার ইঙ্গিত দ্বারা কেহ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে সক্ষম হইত না। তাঁহার পালনে সকলেই সুখে বাস করিতেছিল সুতরাং তাঁহাকেও সর্ব্বপ্রকারে সুখী মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার পুত্র না হওয়ায় তিনি অতিশয় মনোকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। পুত্র হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি সস্ত্রীক রাজধানী ছাড়িয়া কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃতিক শোভায় তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল। তিনি পথে ঘোষবৃদ্ধগণকে দেখিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় অমায়িকভাবে তাহাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে গমন করিলেন। এবং মহিষী সুদক্ষিণাকে প্রাকৃতিক দৃশ্য সকল দেখাইতে লাগিলেন। অতঃপর বশিষ্ঠদেবের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইলে পাছে গুরুদেবের আশ্রম পীড়া হয় এই জন্য সহগামী অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া রাজা কেবলমাত্র মহি-

ষীকে সঙ্গে লইয়া গুরু সন্নিধানে গমন করিলেন। অতঃপর যথা নিয়মে গুরু ও গুরু পত্নীর পদবন্দনা করিয়া গুরুদত্ত আসনে উপবেশন করতঃ আপনার আগমন কারণ নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠদেব ধ্যানস্থ হইয়া ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিলেন এবং রাজার পুত্রোৎপত্তির বিঘ্ন-কারণ অবগত হইলেন। কোন সময়ে রাজা স্বর্গ হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগমনের সময় কোন বিশেষ কারণে অতিশয় ব্যস্ত থাকায় পথিমধ্যে স্বরভিনামক কামধেনুর যথাবিহিত সম্বর্দ্ধনা করেন নাই। স্বরভির অভিশাপে রাজার সন্তান উৎপত্তির বাধা জন্মিয়াছে। স্বরভি তখন পাতালে ছিলেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার উপায় নাই দেখিয়া বশিষ্ঠদেব স্বরভিতনয়া নন্দিনীর সেবা করিতে রাজাকে আদেশ করিলেন। গুরুর আজ্ঞায় রাজা শুদ্ধ মনে মহিষীর সহিত নন্দিনীর সেবা করিতে লাগিলেন। ইহাই প্রথম সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। যাঁহারা স্থূল-চক্ষে এই ব্যাপার দর্শনাভিলাষী তাঁহারা বলিবেন যে রাজধানীও রাজভোগ ছাড়িয়া কিছুদিন অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিলে ও রাখালবেশে ধেনুর পশ্চাৎ বিচরণ করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে শারীরিক সামর্থ্য ও সন্তানোৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইবার কথা। এ মতের প্রতিবাদ অনাবশ্যক।

কেহ কেহ অনুমান করেন দিলিপের সহিত বিক্রমাদিত্য চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়াও ভোগাভি-লাষী ছিলেন না। তাঁহার যেরূপ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রভাবে শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল সেইরূপ তাঁহার ধৈর্য্য, ঔদার্য্য ও ক্ষমাগুণে সকলেই মুগ্ধ হইত। কিন্তু এ অনুমান কতদূর সঙ্গত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গে দিলীপ কর্ত্তৃক নন্দিনীর সেবা, নন্দিনীর প্রসন্নতা ও রাজাকে বরদান বর্ণিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কবি অদ্ভুত সৃষ্টি ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। নন্দিনী রাজার মন বুঝিবার জন্য, তাঁহার আন্তরিক ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য মায়াবলে সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইলেন। নন্দিনীকে যথাসুখে বিচরণ করিতে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্ম রাজা স্বভাবের শোভা দেখিতেছিলেন। রাজা হিমালয়ের শোভা, গঙ্গাপ্রপাতের দৃশ্য তন্ময়চিত্তে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা সিংহের গর্জ্জনে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। রাজা দেখিলেন, নন্দিনী সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া কাতরভাবে তাঁহার দিকে চাহিতেছেন। সিংহের প্রতি শরক্ষেপ করিতে যাইয়া রাজার হস্ত স্তম্ভিত হইল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থিত, এমন সময় মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিয়া সিংহ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিল। চেষ্টার অসাধ্য, সাধ্যের অতীত বিষয়ে নিষ্ফলমনোরথ হইলে ক্ষোভের কারণ থাকা উচিত নহে এইরূপ বুঝাইয়া সিংহ রাজাকে গাভীরক্ষায় নিরাশ হইয়া প্রতিগমন করিতে বলিল। কিন্তু তিনি একে ক্ষত্রিয় তাহাতে রাজা। যে বস্তুর রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছেন প্রাণ থাকিতে তাহা তিনি পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। সিংহও উপস্থিত আহার পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। রাজা যখন নিজশক্তিতে সিংহকে বিনষ্ট বা পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন সিংহের তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করিলেন। নিজ শরীর দিয়া গুরুর গাভী রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং নন্দিনীকে ছাড়িয়া তাঁহার দেহদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্ম সিংহকে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। সিংহ তাঁহাকে অনেক বুঝাইল। একছত্র বসুধার

আধিপত্য, নিজের নবীন বয়স, সুন্দর দেহ, সামান্য একটা গাভীর জন্য রাজাকে পরিত্যাগ ও নষ্ট করিতে দেখিয়া সিংহ তাঁহাকে ভৎ'সনা করিল। তথাপি রাজার মন ফিরিল না। রাজা নিজ দেহের বিনিময়ে গাভীর উদ্ধার সাধন করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজাকে দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া অগত্যা সিংহও তখন গাভীকে মোচন করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে স্বীকৃত হইল। রাজা জড়পিণ্ডের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে সিংহের আক্রমণ অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় নন্দিনী স্নেহবাক্যে তাঁহাকে উঠিতে বলিলেন। রাজা সিংহকে আর দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইলেন। তখন নন্দিনী মায়াজালের সকল বিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। নন্দিনী প্রীতমনে রাজাকে বরদান করিলেন। রাজাও সিদ্ধকাম হইয়া সস্ত্রীক রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর রঘুর জন্ম হইল।

তৃতীয় সর্গের প্রথমে রাজ্ঞী সুদক্ষিণার গর্ভাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। পত্নীর গর্ভাবস্থায় অভিলষিত ভোজ্য ও পেয় যোগাইতে পতি কিরূপ ব্যগ্র হইয়া থাকেন এবং ভার্য্যাকে কিরূপ চক্ষে তখন দেখিয়া থাকেন তাহা বর্ণনা করিতে কালিদাস ভুলেন নাই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে যে পত্নীর প্রতি পতির অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহারও উল্লেখ করিতে কবি ছাড়েন নাই। পুত্রের অঙ্গ স্পর্শে পিতার কিরূপ তৃপ্তি জন্মে, পুত্রের অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য পিতামাতার নিকট কত মিষ্ট বোধ হয় তাহাও কালিদাস চিত্রিত করিয়াছেন। অন্য কবি হয় ত এগুলি উল্লেখযোগ্য মনে করিতেন না। কিন্তু মনুষ্য-চরিত্রে প্রগাঢ়জ্ঞানসম্পন্ন কালিদাস এইগুলিই চরিত্র অঙ্কনের প্রধান উপাদান মনে করিয়াছিলেন। দিলীপকে রাজকার্য্য পরি-

চালনে কঠোরতা অবলম্বন করিতে দেখিয়া তাঁহার গম্ভীর স্বভাবের পরিচয় দিয়া কালিদাস তাঁহাকে ভার্য্যার প্রেমময় পতি ও সন্তানের স্নেহময় পিতাভাবে দেখাইলেন।

কুমার রঘু যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিলে দিলীপ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি নবতিবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এবার শততম যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রঘুকে অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। পৃথিবীতে কেহ কখন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন নাই। সুরপতি ইন্দ্রই কেবল ইহা করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা শতক্রতু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে দিলীপকে তাঁহার কীর্ত্তিলোপতৎপর দেখিয়া তিনি রোষপরবশ হইলেন। এবং যজ্ঞের অশ্ব হরণ করিলেন। এই জন্য অশ্বরক্ষক রঘুর সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। রঘুর শৌর্য্যপ্রকাশে সন্তুষ্ট হইয়া শচীপতি তাঁহাকে বরদান করিলেন যে, দিলীপ শত অশ্বমেধ সম্পাদনের ফল লাভ করিবেন। দিলীপের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। অতঃপর তিনি আপন বৃদ্ধাবস্থা আগতপ্রায় দেখিয়া পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া বনগমন করিলেন।

চতুর্থ সর্গে রঘুর রাজ্যশাসন ও দিগ্বিজয় ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে কবির সমসাময়িক ভারতের যাবতীয় রাজ্যগুলির উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে ভারতযুদ্ধের সমসাময়িক কোশলেশ্বর বৃহদ্বল হইতে প্রায় ৪০ পুরুষ পূর্ব্বে রঘু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সাধারণ হিসাব ধরিলেও ভারতযুদ্ধের প্রায় ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে রঘু বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময় দক্ষিণ দেশে আর্য্যজাতির বসতি ছিল না। রামচন্দ্রের সময় যখন দক্ষিণদেশে ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য ছিল তখন রঘুর সময় সে

দেশে কালিদাসকথিত কেরলরাজ্য স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব এই সর্গে যে সকল রাজ্যের উল্লেখ আছে তাহা যে কবির সময়ে বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন, বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয় ব্যাপার হইতে এই সর্গের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। এ মতে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায়। কেননা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক ভারতজয় অনেকস্থলে উল্লিখিত আছে। যাহা হউক এই দিগ্বিজয় ব্যাপার হইতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারা যায়। কালিদাসের আবির্ভাব কালও এতদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে। পূর্ব্বে ইহা সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এই সর্গে উত্তর ভারতের কোন প্রসিদ্ধ স্থান বা রাজ্যের উল্লেখ নাই। মেঘদূতের পূর্ব্বভাগে মেঘের পথ নির্দ্দেশ উপলক্ষে কয়েকটী স্থানের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের কোন প্রসিদ্ধ জনপদের উল্লেখ দেখা যায় না! ইহাতে বিশ্বাস হয় কবির সময় উত্তর ভারতে বা দক্ষিণাপথে তাদৃশ প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল না। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে ও উত্তর ভারতে অনেক প্রবল রাজ্য ছিল জানিতে পারা যায়। কালিদাস সে সময়ের লোক হইলে নিশ্চয়ই সেগুলির উল্লেখ করিতেন। এইরূপ উল্লেখ না থাকায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কালিদাস ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক নহেন।

রাজা রঘু ভারতীয় রাজন্যবর্গকে জয় করিয়া তাঁহাদের রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করেন নাই। তাঁহাদিগের নিকট করগ্রহণ করিয়া ও উপঢৌকনাদি লইয়া তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ভারতীয় হিন্দুরাজগণ রাজচক্রবর্ত্তী পদবী লাভ করিবার জন্য অন্যান্য রাজগণের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন ও তাঁহাদের

নিকট হইতে করগ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন। বিজিত রাজ্য অপহরণ করিতেন না। রঘু কেবল ভারতীয় রাজগণকে জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্তস্থিত হূন, যবন ও পারসিক জাতিদিগকেও জয় করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে পারসিকেরা ভারতসীমান্তে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল।

রঘু বিজিত রাজগণের নিকট যে অর্থরাশি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা আনিয়া নিজ ভাণ্ডারে রাখেন নাই। তিনি বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করিয়া নিজের সার্ব্বভৌম আধিপত্য ঘোষণা করিলেন এবং উপযুক্ত পাত্রে দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। এমন কি নিজের জন্য বা অতিথি সৎকারের জন্য একটী ধাতুময় পাত্রও রাখিলেন না। এইরূপে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া মৃন্ময় পাত্রে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চম সর্গ।—রাজা রঘু যখন এইরূপ রিক্ত হস্ত হইয়াছেন সেই সময় বরতন্তু ঋষির শিষ্য কৌৎস গুরুর নিকট বেদাদি শাস্ত্রের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা আহরণের আশায় রঘুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ছাত্রগণ তখন গুরুর গৃহে থাকিয়া গুরুর ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। বিদ্যোপার্জ্জনের সময় তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অনন্যমনে শাস্ত্রানুশীলন ও গুরুসেবা করিতেন। অধ্যয়ন সমাপ্তি হইলে তাঁহারা গুরুকে দক্ষিণা দিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিতেন। অর্থাৎ বিবাহ করিয়া গৃহী হইতেন। গুরু কখন কখন শিষ্যের উপর বিরক্ত হইয়া অসঙ্গত দক্ষিণা প্রার্থনা করিতেন। তখন ছাত্রগণ রাজদ্বারে ভিক্ষা করিয়া গুরুর প্রার্থিত অর্থ বা দক্ষিণার সামগ্রী সংগ্রহ করিতেন। কৌৎসও

এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন। কৌৎসের গুরু প্রথমে তাঁহার নিকট কিছুমাত্র দক্ষিণা লইতে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার গুরুভক্তিই যথেষ্ট দক্ষিণা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌৎস দক্ষিণা-গ্রহণে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে বৃদ্ধ ঋষি বিরক্ত হইয়া ছাত্রের নিকট চতুর্দ্দশ বিদ্যা শিক্ষার দক্ষিণা স্বরূপ চতুর্দ্দশ কোটী মুদ্রা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দরিদ্র কৌৎস এত অর্থ কোথায় পাইবেন? অবশেষে তিনি রাজা রঘুর নিকট ধন প্রার্থনা করিতে আগমন করিলেন, কিন্তু রঘুর অবস্থা দেখিয়া তিনি অর্থ চাহিবেন কি প্রস্থা-নের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রঘু তাঁহার যথাবিধি অতিথিসৎকার করিয়া তাঁহার ও তদীয় গুরুর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে কৌৎসের আগমন কারণ জানিতে চাহিলেন। কৌৎস যথাযথ নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া গুরুর দক্ষিণাসংগ্রহের জন্য গ্রামান্তর গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রঘু তখন একেবারে রিক্তহস্ত হইয়াছেন, তাঁহার গৃহে ধাতুপাত্রটী অবশিষ্ট নাই, অর্থসংগ্রহের কোন উপায় নাই, তথাপি যাচক তাঁহার নিকট হইতে নিষ্ফল মনোরথ হইয়া অন্য লোকের নিকট যাইবে—তাঁহার মহদন্তঃকরণে ইহা সহ্য হইল না। যাচকের প্রার্থনাপূরণে রঘু অক্ষম হইয়াছেন এই লোকনিন্দা হইবে ভাবিয়া তিনি কৌৎসকে ২।৩ দিন তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন। কৌৎসও স্বীকৃত হইলেন। রঘু তখন প্রার্থিত অর্থ কিরূপে সংগ্রহ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবী অর্থশূন্যা হইয়াছে জানিয়া তিনি ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে অর্থ আহরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। যক্ষরাজ কুবেরকে জয় করিতে প্রভাতে যাত্রা করিবেন স্থির করিয়া রঘু সুপ্ত হইলেন।

রাত্রিমধ্যে তাঁহার ভাণ্ডারে স্বর্ণ বৃষ্টি হইল। কুবের তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তদীয় ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। রঘুও কৌৎসকে তৎসমস্ত দান করিলেন। প্রার্থিত অর্থের অতিরিক্ত কৌৎস প্রথমে লইতে স্বীকৃত হইলেন না কিন্তু রঘুর অনুরোধে শেষে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজাকে "আপনার পিতার ন্যায় আত্মঅনুরূপ পুত্রলাভ করুন" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া কৌৎস অর্থ লইয়া গুরুসকাশে গমন করিলেন।

রঘু ও আত্মসদৃশ পুত্রলাভ করিলেন। এই পুত্রের নাম অজ। যথাবিধি বিদ্যালাভ করিয়া অজ যৌবনসীমায় পদার্পন করিলে বিদর্ভরাজ নিজ ভগ্নী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে অজকে পাঠাইবার জন্য রাজা রঘুর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সম্বন্ধটী শ্লাঘ্য মনে করিয়া রঘু পুত্রকে সসৈন্যে বিদর্ভরাজধানীতে যাইতে অনুমতি দিলেন। পথিমধ্যে নর্ম্মদাতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। একটী বন্যগজ আসিয়া সেনাশিবির উপদ্রুত করিল। বন্যগজ রাজার অবধ্য জানিয়া অজ তাহাকে ভয় দেখাইয়া বিমুখ করিবার জন্য প্রহার করিলে সে দিব্যমূর্ত্তি গন্ধর্ব্ব হইল। গন্ধর্ব্ব অজের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্মোহন নামে অস্ত্র দান করিল। অনন্তর অজ বিদর্ভ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া বিদর্ভরাজ তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট ভবনে লইয়া গেলেন। ইহাই পঞ্চম সর্গের বর্ণনীয় বিষয়।

পঞ্চম সর্গে রঘুর অসীম দানশীলতার পরিচয় দিয়া কবি দেখাইলেন যে, দিলীপ যেরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ, স্বার্থত্যাগী, আত্মোৎসর্গে রত ছিলেন, রঘুও সেই সকল গুণসম্পন্ন হইয়া অধিকন্তু দানশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। দিলীপের দানশীলতা ও ত্যাগ